পঞ্চম অধ্যায়ঃ

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস এবং সমকালীন নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা ঃ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
- প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- জগদীশ গুপ্ত ।
- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ।
- মনোজ বসু।
- অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ।
- প্রেমেন্দ্র মিত্র।
- বুদ্ধদেব বসু।
- প্রবোধ কুমার সান্যাল।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস এবং সমকালীন বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা

সুদীর্ঘ ষাট বৎসর ব্যাপী সাহিত্য সাধনা করে বাংলা সাহিত্যে যিনি দিয়ে গেছেন বৈচিত্র্যের সন্ধান, গভীর জীবন জিজ্ঞাসা ও সূক্ষ্ম ভাবনাচিন্তাকে যিনি ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসের কলা কৌশলে, উপগ্রহরূপে অবস্থান না করে সৌররশ্মির আদিগন্ত ছটায় ভাস্বর সেই স্বতন্ত্র ধারার কথাকার প্রমথনাথের সাহিত্য রচনাকালে বহু প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছিল তারাই সমকালীন সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত।

প্রমথনাথ যখন সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হলেন তখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবন সমুদ্রে তরঙ্গের আঘাতে উদ্বেল। রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্ত যে সনাতন ধর্মে আস্থা, সমকালীন মূল্যবোধের শ্রদ্ধা ও গতানুগতিক সহজ সরল জীবন ধারার পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটল যেখানে রবীন্দ্র শরতের সাহিত্যের পরিবর্তে ভিন্নতর আঙ্গিক ও বিষয় বস্তু নিয়ে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হল প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' মণীন্দ্রলালের 'ভারতী', দীনেশ রঞ্জনের 'কল্লোলগোষ্ঠী (১৯২৩)'। এছাড়া 'কালি কলম (১৯২৬)',' প্রগতি(১৯২৭)',' আত্মশক্তি',' ধূপছায়া' 'বিচিত্রা', 'শনিবারের চিঠি', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সাহিত্য জগতের নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করেছিল।

এই উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগোষ্ঠী যে পটভূমিকায় গড়ে উঠেছিল সে প্রসঙ্গ এখানে

উল্লেখের দাবী রাখে। একদিকে ফ্রয়েডের যৌনতত্ত্ব, কন্টিনেন্টাল সাহিত্য, রুশবিপ্লবের প্রভাবে মার্ক্সের সাম্যবাদী দর্শন, দু দুটো মহাযুদ্ধের প্রভাব, ঔপনিবেশিক শাসনে পর্যুদস্ত জাতীয় আন্দোলনতা কখনও উত্তাল কখনও স্তিমিত, নরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ভারতভূমি যখন প্রকম্পিত, আগষ্ট বিপ্লব, নেতাজী ও গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা দেশে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 'ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি' পরিশেষে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই কাল প্রবাহে পুরনো মূল্যবোধ, ধর্ম বিশ্বাস ও নীতিবোধ যখন প্রচন্ড ভাঙ্গনের মুখে তখন কথাশিল্পী প্রমথনাথ ও সমকালীন লেখকদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

প্রমথনাথের কথাসাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সময় তাঁর সামনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কল্লোল যুগের অন্যান্য লেখকবৃন্দ তাদের মধ্যে মণীন্দ্র লাল বসু, গোকুল নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, শৈলজানন্দ মুখ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, মণীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রমুখ। এছাড়া অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সরোজ কুমার রায় চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, গজেন্দ্র কুমার মিত্র, সুবোধ ঘোষ প্রমুখ লেখকবৃন্দ। এই সাহিত্যিক পরিমন্ডলের মধ্যে থেকেও প্রমথনাথ বিশী কিভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সূত্রে সমকালীন লেখকদের সঙ্গে তাঁর কোথায় পার্থক্য ও যোগসূত্র, তার একটি পর্যালোচনা করাই হবে এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

প্রমথনাথ বিশী ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের তুলনামূলক পর্যালোচনা

কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র স্নেহধন্য প্রমথনাথের ঘটেছিল রবীন্দ্র প্রতিভার সঙ্গে আত্মিক পরিচয়। তাঁদের জন্মকালের ব্যবধান অনেক বেশী হলেও দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী নানাভাবে, নানাস্থানে, নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেয়েছেন তিনি। প্রমথনাথের 'দেশের শত্রু'(১৯২৫) যখন প্রকাশিত হয় তাঁর আগেই রবীন্দ্রনাথের 'করুণা' (১৮৭৭-৭৮),'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি'(১৮৮৭), 'চোখের বালি'(১৯০৩) , 'নৌকাডুবি'(১৯০৬), 'গোরা'(১৯১০), 'চতুরঙ্গ'(১৯১৬), 'ঘরে বাইরে'(১৯১৬) প্রকাশিত হয়েছে। এরপর ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা', ১৯৩৩ সালে 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' এবং সর্বশেষ উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৩৪। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ২২ শে শ্রাবণ) আগে প্রমথনাথের 'দেশের শত্রু' ছাড়াও 'কোপবতী', 'পদ্মা ', 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সর্বমোট চৌদ্দটি উপন্যাস লিখলেও 'করুণা' ও 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' বাদ দিয়ে বারোটি উপন্যাস পূর্ণমর্যাদা লাভ করেছে। প্রমথনাথের 'দেশের শত্রু' উপন্যাস বাদ দিয়ে সতেরোটি উপন্যাস নানা বৈচিত্র্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। দুজন লেখকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি নির্বাচিত করা হয়েছে এবং তাদের উপন্যাসের পার্থক্য ও যোগসূত্র নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ—

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য অতীত ঐতিহ্য - দূর অতীতের প্রতি মোহমুগ্ধদৃষ্টি, নবযুগের পদধ্বনি, প্রকৃতি ও মানব চরিত্রের অন্তরঙ্গতা, ঘটনার ঘনঘটা,

বহুবিচিত্র চরিত্রের উপস্থাপনা, অনতিপরিসর স্থান, কালের বিস্তৃতি, অতীত যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পারম্পর্য রক্ষার চেষ্টা। অপরদিকে ব্যক্তিত্বোদ্ভূত সমস্যা, সীমিত সংখ্যক চরিত্র, মনোগহনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, উচ্চ সংস্কৃতিবোধ যুক্ত মন, অপূর্ব ভাষা, অনতিপরিসর স্থান ও সময়সীমার স্বল্পতা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। তিনি কাহিনীর উত্তাল ঘটনাস্রোতকে প্রাধান্য না দিয়ে চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। 'আঁতের কথা' বের করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি প্রমথনাথের মতো অতীত যুগ থেকে বর্তমান যুগকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেন নি। এখানেই প্রমথনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক পার্থক্য।

উপন্যাসের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে প্রমথনাথ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত মূল পিরামিডের মতো আখ্যানভাগ গঠনের প্রয়াসী এবং নাট্যগুণের বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের আখ্যানগঠনের ক্ষেত্রে বক্ররেখ গতির প্রাধান্য। নাটকীয়তা থেকে দূরে থেকে কাহিনী, ঘটনা ও মানব হৃদয়ের ছোট বড় তরঙ্গ তুলে ক্রমেই পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে যুগধর্মের প্রতিচ্ছবি আছে কিন্তু সে যুগ অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুগ। আর যে যুগে বসে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন তখন সামন্ততান্ত্রিক যুগ পেরিয়ে ধনতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটেছে তার অব্যবহিত কাল পরেই এসেছে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশপর্ব। যুগ সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রমথনাথের শিল্পীমানস সদা বিচরণশীল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে প্রমথীয় সাহিত্যে। চরিত্র চিত্রায়ণে বাস্তববাদের সঙ্গে আদর্শবাদের মেলবন্ধন গড়ে তোলেন নি। অপরদিকে প্রমথনাথের উপন্যাসে রোমান্টিকতার সুর দুর্লভ নয় তবুও চরিত্র সৃজনের ক্ষেত্রে

ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে সমাজবাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় তাদের ঈর্ষাবিদ্বেষ, হাসিকান্না, পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে বলে প্রমথনাথ বাস্তব সচেতন কথাশিল্পী।

রবীন্দ্রনাথ ভাববাদী হলেও সমন্বয়বাদী ভারতীয় দর্শনে বিশ্বাসী। এই সমন্বয় ঘটেছে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমন্বয় সাধন ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য। কোন চিরন্তন নীতিকে তিনি মেনে চলেন নি। নীতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের মৌলিক পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ যুগধর্মের শিল্পী। তাঁর সৃষ্টিতে দুটো যুগের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ঊনিশ শতকের সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ শতকের ধনতন্ত্রের বিরোধ ও সমাজতন্ত্রের বিকাশ এই দুই যুগের দুই ধারা রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রতিফলিত। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জন্ম রোমান্টিক কবি তাঁর কথাসাহিত্যে রোমান্টিকতার অভাব নেই। তবে কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় বাস্তববাদী শিল্পী হিসেবে। তবে চরিত্রায়ণে বাস্তবতা ও আদর্শবাদ উভয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সামাজিক মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছিল সৌন্দর্যপ্রিয় কবি দৃষ্টি। এই গুণে তার উপন্যাসের চরিত্র, সংলাপ অনেক ক্ষেত্রে কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে তবে এই কবি সত্তা কোনও কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলে নি বাস্তব জীবনের সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনা, আকুতি ও আর্তি নিয়ে বাস্তব জগতে চলাফেরা করেছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসকে আমরা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, একটি ঐতিহাসিক অপরটি সামাজিক। তবে কথাশিল্পী হিসেবে প্রমথনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায়। 'দেশের শত্রু', 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত', 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' প্রভৃতি উপন্যাস ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত। দূরকাল

প্রমথনাথের কলমে বর্তমানের প্রতিবিম্বে ধরা দিয়েছে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি দূর অতীতের দিকে নিবদ্ধ থাকে নি তবে 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' নিকট অতীতের ইতিহাস মাত্র যা তার উন্মেষপর্বের সৃষ্টি। প্রমথনাথের সামাজিক উপন্যাস হল 'পদ্মা' ও 'কোপবতী' বলতে গেলে এই দুটি উপন্যাসই বর্তমানের প্রেক্ষাপটে রচিত। এছাড়া পুরাণ কেন্দ্রিক উপন্যাস 'পূর্ণাবতার' প্রমথনাথের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লিখে কথাশিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।'চোখের বালি' 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। প্রমথনাথের 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসটি মহাকাব্যিক অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসটি মহাকাব্যিক।

প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমিও স্বতন্ত্র। প্রমথনাথের উপন্যাসের ঘটনাভূমি যেমন রাঢ়দেশ, রাজসাহী, পাবনা ও দিনাজপুর জেলা অর্থাৎ অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের অংশ এবং কলকাতা, মালদহ, দিল্লী বা শাহজাহানাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা। 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের ঘটনাভূমি বৃহত্তর কলকাতা, 'পদ্মা' উপন্যাসের উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পদ্মা নদীর একটি চর যার নাম চরচিলমারী, মুর্শিদাবাদ জেলার কার্ত্তিকপুর, কলকাতা ও দার্জিলিং, 'কোপবতী' উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি বোলপুর, শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী তালবনী গ্রাম, কোপাই নদীর তীর ও তার উৎসভূমি সাঁওতাল পরগণা, 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি রাজসাহী ও পাবনা জেলার অন্তর্গত জোড়াদীঘি গ্রাম, রক্তদহ গ্রাম ও কইজুড়ি গ্রাম, ছোট ধুলোউড়ির কুঠি, 'অশ্বত্থের অভিশাপ' এ কলকাতার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে, 'কেরী সাহেবের

মুন্সী' উপন্যাসের পটভূমি কলকাতার কাশীপুর, মালদহ জেলার মদনাবাটী, জোড়ামউগ্রাম ও কলকাতা, 'লালকেল্লা' উপন্যাসের শাহজাহানাবাদ বা দিল্লী ও লক্ষ্মৌ, 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা আবার কলকাতার ঘটনা স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ঘটনাস্থল কলকাতা শহর ও গ্রামাঞ্চল। 'চোখের বালি'র ঘটনা প্রবাহ কিছুটা বারাসত ও কাশী বেশিরভাগ কলকাতায়। 'নৌকাডুবির' কাহিনী ঘটেছে প্রধানতঃ কলকাতায় - কাশীতে ও গাজিপুরে, কিছুটা পদ্মার চরে, গোয়ালনন্দ থেকে গাজিপুরে - পদ্মা ও গঙ্গার ষ্টীমারে। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি ত্রিপুরা। 'গোরা' কলকাতার কাহিনী, অল্পকালের জন্য চরঘোষপুর গ্রাম স্থান পেয়েছে। 'চতুরঙ্গে' কলকাতা, চট্টগ্রামের সুদূর পল্লী ও অন্যান্য গ্রামের নীলকুঠি। 'যোগাযোগে' নুরনগরের গুরুত্ব থাকলেও কলকাতার প্রাধান্য। 'দুইবোন', 'মালঞ্চ','চার অধ্যায়' কলকাতার গল্প, 'ঘরে বাইরে' গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাস, 'শেষের কবিতা'য় কলকাতা কিছুটা থাকলেও শিলং পাহাড় এর ভৌগোলিক পটভূমি। সব মিলিয়ে কলকাতা শহর কেন্দ্র করে রবীন্দ্র উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি গড়ে উঠেছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসের নদী পদ্মা, পূর্ববঙ্গের যমুনা, গরল, কোপাই, ভাগীরথী, যমুনা যা দিল্লীর পূর্বদিকে প্রবাহিত এবং পাবনা জেলার অন্তর্গত একটি বিল যার নাম চলনবিল। অপরদিকে রবীন্দ্র উপন্যাসের নদী হল গঙ্গা, ভাগীরথী ও পদ্মা।

প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিষয়ভূমির তুলনামূলক আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। ঔপন্যাসিকদ্বয়ের বিষয়ভূমি বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রমথনাথের স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ও কবিদের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের বিষয়,

কাজেই রাজনৈতিক ঘটনা এর মূল প্রতিপাদ্য। 'পদ্মা' উপন্যাসের বিষয়ভূমি সমাজ জীবন ও প্রেমবোধ, এর গৌণ সমস্যা প্রেমমনস্তত্ত্ব। এখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে। 'কোপবতী' উপন্যাসের মূল সমস্যা কল্পনা ও বাস্তবের বিরোধ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় এখানে নেই। 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাস ত্রয়ীতে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও ধনতন্ত্র থেকে উদ্ভূত সাম্রাজ্যবাদের উত্তরণ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বে নবীনের জয়গান অর্থাৎ আধুনিকতার জয়ধ্বনি উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। জমিদারতন্ত্রের ভাঙ্গন, জনকল্যাণ মূলক কাজে অংশ গ্রহণ, পুনরায় জমিদারী প্রতিষ্ঠা ও আমলাতন্ত্রের ক্রীড়নক রূপে দেখানো হয়েছে উপন্যাস ত্রয়ীতে। উপন্যাস ত্রয়ের গৌণ সমস্যা প্রেম এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখানে অনেকটা প্রবল। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কলকাতা শহরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্যোগ, বাবু সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, সতীদাহ প্রথার পৈশাচিক রূপ, ইংরেজি প্রেম, গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন প্রভৃতি বিষয় উনবিংশ শতকের ঐতিহাসিক উপাদান উপস্থাপিত হয়েছে। প্রমথনাথের 'লালকেল্লা' উপন্যাসের বিষয়ভূমি হল শেষ মোঘল বাদশার পরাজয় এটি মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই যুগান্তকারী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিপাহী বিদ্রোহোত্তর শাহজাহানাবাদের অবস্থা, ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে বাদশা বাহাদুর শার রক্তক্ষয়ী বিরোধ এবং তৎকালীন সামাজিক অবস্থা ও প্রেমবোধের প্রকাশ উপন্যাসের মূল আলোচ্য বিষয়। 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথ ও চরমপন্থী নেতাদের সক্রিয়তা, দিনাজশাহী শহরের কয়েকটি পরিবারকে কেন্দ্র করে ঘটনার জটাজাল বিস্তৃত হয়েছে। 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে কি করে ভারতের রক্তাক্ত স্বাধীনতা লাভ হয়েছে তার চারটি পন্থা উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য।

রবীন্দ্রনাথের 'করুণা' উপন্যাসের বিষয় প্রেম হলেও বধূনির্যাতনের খুঁটিনাটি ছবিও দুর্লভ নয়। এটি একটি পারিবারিকউপন্যাস। 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস দুটির বিষয় পুরনো ইতিহাস। 'বউঠাকুরাণীর হাট'এ প্রেম ও রাজনীতি এবং 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ধর্মবোধের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। 'চোখের বালি ' উপন্যাসের বিষয় প্রেম। পারিবারিক জীবনের বাস্তব রূপ আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নরনারীর সম্পর্ক ঘটিত কিছু জটিল সামাজিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ। 'নৌকাডুবির' বিষয় 'চোখের বালি'র সমধর্মী। 'গোরা' উপন্যাসের বিষয় রাজনীতি, ধর্ম ও প্রেম। 'চতুরঙ্গে'র বিষয় প্রেম ও ধর্ম। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি প্রেম ও রাজনীতি। এখানকার পারিবারিক চিত্র সামাজিক সমস্যার অভিমুখী। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিষয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম ও প্রেম। 'শেষের কবিতা'র বিষয় প্রেম, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাস এর মূল প্রতিপাদ্য। 'দুইবোন' উপন্যাসের বিষয় প্রেম। 'মালঞ্চ' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের বিষয় প্রেম ও রাজনীতি।

প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় প্রমথনাথের উপন্যাস গুলির বিষয় অতীত ইতিহাস কোনটি দূর অতীত, কোনটি নিকট অতীত। কৃষিসভ্যতার বিকাশ থেকে শুরু করে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত ইতিহাসের ধারা পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করতে গিয়ে জাতীয় ভাবধারা উপজীব্য হয়ে উঠেছে। প্রমথনাথের সামাজিক উপন্যাসদ্বয় উন্মেষপর্বের সৃষ্টি এখানে রবীন্দ্র উপন্যাসের কাব্যগুণ আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। আধুনিক জীবনের সমস্যার চেয়ে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের আলোকে জটিল মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন প্রমথনাথ। 'পদ্মা' ও 'কোপবতী' দুটি উপন্যাসেরই উপসংহার টেনেছেন ট্র্যাজিক পরিণতিতে। অপরদিকে রবীন্দ্র

উপন্যাসগুলি সামাজিক। 'চোখের বালি' থেকেই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার সূত্রপাত এবং 'চতুরঙ্গ' বাংলা সামাজিক উপন্যাসের একটা মাইলস্টোন স্বরূপ।

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের নায়করা সাধারণ শ্রেণীভূক্ত। একমাত্র ব্যতিক্রম 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের নায়ক উদয়নারায়ণ ও 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসের নায়ক নবীননারায়ণ। এছাড়া অন্যান্য উপন্যাসের নায়করা অভিজাত শ্রেণীভূক্ত নয় সাধারণ স্তরের মানুষ মাত্র। 'পদ্মা' উপন্যাসের নায়ক বিনয় অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছুটা সচ্ছল হলেও অভিজাত শ্রেণীভুক্ত নয়। 'কোপবতী' উপন্যাসের নায়ক বিমল সাধারণ গৃহস্থ পরিবার থেকে উঠে আসা উচ্চ শিক্ষিত চরিত্র। বিনয় ও বিমল দুজনেই কলকাতা থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত নায়ক। 'চলনবিল' উপন্যাসের নায়ক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার দর্পনারায়ণ, 'ধুলোউড়ির কুঠি' উপন্যাসের নায়ক দীপ্তিনারায়ণ অবক্ষয়িত জমিদার দর্পনারায়ণের পুত্র। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের নায়ক রামরামবসু উইলিয়াম কেরীর মুন্সী, এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক, 'লালকেল্লা' উপন্যাসের নায়ক বাদশা বাহাদুর শাহ নয় একজন ইংরেজ কোম্পানীর রেসেলাদার পদে নিযুক্ত সৈনিক, 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের নায়ক রায়বাহাদুর এবং 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের নায়ক শচীন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের দলভূক্ত।

অপরপক্ষে রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়করা অভিজাত শ্রেণীভূক্ত ও উচ্চবংশজাত। যদিও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস থেকে নায়করা কায়স্থ শ্রেণীভূক্ত। পূর্ববর্তী উপন্যাসের নায়করা ছিল ব্রাহ্মণ। 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র ও বিহারী, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশ, 'যোগাযোগ' উপন্যাসের মুকুন্দলাল ও বিপ্রদাস, 'দুই বোন' উপন্যাসের রাজারাম তারা প্রত্যেকেই অভিজাত শ্রেণীভূক্ত এবং জমিদার পরিবারভূক্ত।

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের নায়িকারা স্বল্পশিক্ষিতা এবং একমাত্র ব্যতিক্রম মুক্তামালা। মুক্তামালা শহরের মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সে সুযোগ পেয়েছে। 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের সীতা স্বল্প শিক্ষিতা হলেও 'কোপবতী' উপন্যাসের ফুল্লরা, 'পদ্মা' উপন্যাসের কঙ্কণ, 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার উপন্যাসের বনমালা, 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের রেশমী, 'লালকেল্লা' উপন্যাসের তুলসী, 'বঙ্গভঙ্গ' উপনাসের রুক্মিণী, 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের মলিনা কেউ উচ্চ শিক্ষিতা নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়িকারা বেশিরভাগ আধুনিক শিক্ষা পেয়েছে। 'নৌকাডুবি'র হেমনলিনী, 'গোরা'র সুচরিতা, 'চোখের বালি'র লাবণ্য, 'দুই বোন' এর উর্মি, 'মালঞ্চ' উপন্যাসের সরলা; 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের এলা সকলেই কলেজ পাশ করেছে। তবে কমলা, বিনোদিনী ও বিমলা স্কুলে ও গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করেছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে বিদ্রোহিণী নারী চরিত্র রূপে আমরা পাই ইন্দ্রাণী, সীতা, রেশমী, শুভ্রা প্রভৃতি চরিত্র। তন্মধ্যে পৌরাণিক আদর্শে গঠিত হয়েছে ইন্দ্রাণী চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিনোদিনী, 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমু প্রত্যেকেই বিদ্রোহিণী নারী চরিত্র।

প্রমথনাথের উপন্যাসে বিধবা নারী চরিত্রের বাড়াবাড়ি নেই। শুধুমাত্র চলনবিল উপন্যাসের কুসমি চরিত্র ও 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের রেশমী চরিত্রদ্বয় বালবিধবা নারী চরিত্র হিসাবে পরিচিতা। কুসমি বৈধব্য জীবন কাটিয়েছে, রেশমী আত্মাহুতি দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের নায়িকা বিনোদিনী, 'করুণা'র উপন্যাসে বালবিধবা মোহিনী এবং 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনী প্রত্যেকেই নায়িকা বিধবা নারী চরিত্র। আশা মহেন্দ্রের দাম্পত্যজীবনে বিধবা বিনোদিনী তার অতৃপ্ত জীবনের ব্যর্থতাকে

কামনা বাসনা ভাললাগায় পূর্ণ করল। কিন্তু বিনোদিনীর মধ্যে ছিল না পাওয়ার ব্যর্থতা - কুসমি ও মোহনের প্রেমের মধ্যেও ছিল না পাওয়া জনিত ব্যর্থতা । কিন্তু 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনীকে রবীন্দ্রনাথ স্বামী দিয়েছেন, সংসার জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ দিয়েছেন, দাম্পত্য সুখ দিয়েছেন তবুও দামিনীর মধ্যে পেয়েও ভোগ না করার ব্যর্থতা দানা বেঁধেছে। রেশমীর সঙ্গে জনের অবৈধ প্রেম ভোগবাসনাকে চরিতার্থ করলেও তাদের ট্র্যাজিক পরিণতি দান করেছে। বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হলেও প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ দেননি।

আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল প্রমথনাথের নায়িকাদের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা হতে পারে নি। যদিও কঙ্কণ মাতৃত্বের স্বাদ পেয়েছে, প্রতিনায়িকা দর্পনারায়ণ পত্নী বনমালা সন্তানকে পেয়ে মাতৃসত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছে। কিন্তু 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের সীতা, 'কোপবতী' উপন্যাসের ফুল্লরা, ইন্দ্রাণী, মুক্তামালা, রেশমী, তুলসী, কুসমি, শুভ্রা, মলিনা কেউই নন মা। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে কোন নায়িকা চরিত্রই মা হতে পারে নি। 'চার অধ্যায়ের' দামিনী, কুমু, এলা, বিমলা, 'গোরা'র সুচরিতা, কেউই সন্তানবতী জননী নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই আদর্শের নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

প্রমথনাথের উপন্যাসে প্রণয় ত্রিভুজের প্রসঙ্গ এসেছে আখ্যান গঠনের প্রশ্নে। 'পদ্মা' উপন্যাসে পারুল ও কঙ্কণকে নিয়ে বিনয়ের প্রণয় ত্রিভুজ গড়ে উঠেছে, 'কোপবতী' উপন্যাসে প্রণয় ত্রিভুজ গঠনের ক্ষেত্রে কোপাই নদীর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। বিমল, ফুল্লরা ও কোপাই এই প্রণয় ত্রিভুজ অঙ্কিত হয়েছে। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে জন, রামরাম ও রেশমীকে ঘিরে প্রণয় ত্রিভুজ গড়ে উঠেছে। 'লালকেল্লা'য় জীবনলালকে

ঘিরে তুলসী, রুমালী, পান্না এই নায়িকা ত্রয়ীর প্রেম ভাবনা অসামান্য তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যেও প্রণয় ত্রিভুজের অভাব নেই। 'করুণা' উপন্যাসের ত্রিভুজ প্রেমের দৃষ্টান্ত মহেন্দ্র, রজনী ও মোহিনী, 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের উদয়, 'সুরমা' ও 'মঙ্গলা' উপন্যাসদ্বয়ে দুজন রমণী একজন পুরুষের প্রেমের ঘাত প্রতিঘাত বর্ণিত হয়েছে। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' ও 'চার অধ্যায়ে' দুজন পাত্র একজন পাত্রীকে নিয়ে প্রণয় ত্রিভুজ গড়ে উঠেছে। সুচরিতাকে নিয়ে গোরা ও পানুবাবু, বিমলাকে নিয়ে নিখিলেশ ও সন্দীপ, দামিনীকে নিয়ে সতীশ ও শ্রীবিলাস এবং এলাকে নিয়ে অতীন ও বটুর প্রণয় ত্রিভুজ গড়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য নারী মনস্তত্ত্বের জটিলতাকে রবীন্দ্রনাথ উন্মোচন করেছেন তাঁর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে জননী চরিত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কাহিনী গ্রন্থনে জননী চরিত্রগুলো ঘটনার গতিকে পরিবর্তিত রূপ এনে দিয়েছে। 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের সুকেশিনী দেবী ও সুলেখা দেবী জননী চরিত্র। এই চরিত্রদ্বয় নারী জাগরণের প্রতীক হলেও আদর্শ জননীর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নি। 'চলনবিল' উপন্যাসে ডাকুরায়ের জননী ক্ষেন্তবুড়ীর সন্তান বাৎসল্য বাস্তবধর্মী, 'লালকেল্লা'র ভূতিবুড়ি একাধারে সুখানন্দের পরিচারিকা ও জননীর মর্যাদায় অভিষিক্তা, 'পদ্মা' উপন্যাসের সর্বেশ্বরী, 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের অন্নদা, 'চলনবিলে'র কুসমী জননী অর্ধোন্মাদ চাঁপা, 'বঙ্গভঙ্গে'র নিস্তারিনী দেবী ও বিন্দুবাসিনী উল্লেখযোগ্যে জননী চরিত্র। জননী চরিত্রের নামকরণগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পৌরাণিকী।

রবীন্দ্রসাহিত্যেও জননী চরিত্র বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে। 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'চার অধ্যায়', 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে জননী চরিত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। 'চোখের

বালি' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীর ভয়ঙ্কর ঈর্ষা কাহিনীর গতিকে পরিবর্তিত করেছে। 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনীর জননী নন্দরাণী, 'শেষের কবিতা'র শর্মিলা 'চার অধ্যায়' এর মায়াময়ী, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিমলার মা, 'গোরা' উপন্যাসের সন্তানহীনা আনন্দময়ীর মধ্যে মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আনন্দময়ী বিনয়, সুচরিতা, ললিতা প্রত্যেকেরই মা হতে পেরেছেন তাঁর স্নেহে, প্রসন্নতায়, ত্যাগে, সংস্কারমুক্ত মনে সর্বংসহ ভূমিকায় তিনি জননী। গোরা আনন্দময়ীর মধ্যে ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করেছেন — " মা তুমিই আমার মা, তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথনাথের পার্থক্য হল রবীন্দ্রনাথ মাতৃহৃদয়ের রহস্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্‌ঘাটন করেছেন, প্রমথনাথ মাতৃহৃদয়ের চেয়ে পিতৃহৃদয়ের জয়গানে মুখর। জীবনলালের পিতা, খুনী সুখানন্দ, ডাকাত সর্দার ডাকুরায়, জমিদার উদয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, অবিনাশবাবু, যজ্ঞেশ রায় প্রভৃতি চরিত্রে পিতৃহৃদয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

কথাশিল্পী প্রমথনাথের প্রেমভাবনায় বিশেষ কোন তত্ত্বরূপে দেখা দেয়নি। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রেমবিকলন প্রমথনাথের উপন্যাসের মূল বিষয়। বিমল ফুল্লরার দুর্বার প্রেমাকাঙ্ক্ষা, বিনয় কঙ্কণের দেহজ প্রেম, জন রেশমীর প্রেমানুভূতি, পিনাকবাবুর ও সীতার কামনা বাসনা, রুমালী ও জীবনলালের প্রেমচেতনা মর্ত্য প্রেমের দৃষ্টান্ত সুদূরাভিসারের দিকে যাত্রা করেনি।

অপরদিকে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম একটি তত্ত্ব রূপে দেখা দিয়েছে। তবে কল্লোল পূর্ব ও কল্লোলোত্তর রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে প্রেমের দ্বৈতরূপ প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে মর্ত্যমাধুরীর ধূলিমালিন্য যুক্ত প্রেম ও সুদূরের পিয়াসী প্রেমভাবনা উচ্চারিত হয়েছে।

'শেষের কবিতা'র অমিত ও লাবণ্যের প্রেমভাবনা, 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ'র প্রেমরহস্য সমান্তরাল ধারায় এগিয়ে গেছে। এতকাল প্রেম ও বিবাহ ছিল সমার্থক রূপে এই স্তরে এসে প্রেম বিবাহের গন্ডীকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। কল্লোলের ভাষা, সংলাপ, সমাজদ্রোহ পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলোতে ফুটিয়ে তুলে আধুনিক কথাসাহিত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রমথনাথের উপন্যাসে ধর্মপ্রসঙ্গ একেবারে অনুচ্চারিত বললে হয়তো সঠিক বিচার হবে না। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে খ্রীষ্টগীতি মূলতঃ যিশুবন্দনা, মদনমোহন তলায় রেশমী ও টুশকীর আরতী দর্শন, 'লালকেল্লা' উপন্যাসে তুলসী, পান্নার মীরার ভজনগীতি, সুখানন্দের গৃহে সত্যনারায়ণ পূজা, শাহজাদার হাত থেকে বাঁচতে চেয়ে মহাভারতের শ্লোক পাঠ, কুসমির সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ধর্মচেতনার উদার মহত্ত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে উঠেছে।

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসে বলিপ্রথার বিরুদ্ধে একটি কথাই উঠে এসেছে 'মা রক্ত চান না চান ভক্তি'। 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' উপন্যাসে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের বিরোধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে উদার মানবধর্মের মধ্য দিয়ে। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', উপন্যাসে উদার মানববন্দনায় মুখর হয়েছেন কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

প্রমথনাথের প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই প্রকৃতিপ্রেমিক কবিমনের অধিকারী। প্রমথনাথের প্রথম জীবনের উপন্যাস 'পদ্মা', 'কোপবতী'তে নিসর্গ সৌন্দর্যের অনবদ্য রূপের উচ্চ প্রশংসা করেছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাস ত্রয়ীতে প্রাকৃতিক পটভূমি নির্মাণে ও পরিবেশের সহায়তায় শিল্পসুষমা মন্ডিত

হয়ে উঠেছে। তবে পরবর্তী পর্বের উপন্যাসগুলোতে প্রকৃতির ভূমিকা অনেকটা কমে এসেছে। প্রকৃতি সেখানে মানবচরিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে ওঠে নি।

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের প্রথম তিনটি উপন্যাসে প্রকৃতির ভূমিকা থাকলেও তিনি যত পরিণত হয়ে উঠেছেন ততই কথাসাহিত্যে প্রকৃতির প্রসঙ্গ কমে এসেছে। 'চোখের বালি' উপন্যাস থেকে প্রকৃতিকে আর তেমনভাবে দেখা যায় না। এছাড়া রবীন্দ্র উপন্যাসে লাবণ্যময় নিসর্গ চিত্র থাকলেও প্রকৃতির আত্মিক সত্তা গড়ে ওঠে নি। প্রমথনাথের উপন্যাসের মূল থীমের সঙ্গে প্রকৃতির যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসগুলিতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মূল থীমের সঙ্গে প্রকৃতিপ্রেম একীভূত হয়ে ওঠে নি।

কথাশিল্পী প্রমথনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। প্রমথনাথের প্রাক্স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসগুলিতে স্বদেশ প্রেমের বিশেষ স্থান নেই। তবে 'দেশের শত্রু' উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমিক ও স্বদেশী কবিদের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর স্বদেশ চেতনার সাক্ষ্য বহন করে 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে। তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তোষণকারী ব্যক্তি, তাদের পদলেহনকারী চরিত্রের প্রতি বিদ্রূপ করেছেন। চরমপন্থী ও নরমপন্থী মতবাদের মধ্যে প্রমথনাথ নরমপন্থী মতবাদের বিশ্বাসী।

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠসম্পর্ক। স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করলেও তার স্বদেশ প্রেমের ধারণা ছিল স্বতন্ত্র। কোন উচ্ছ্বাস প্রবণতাকে তিনি সহ্য করেন নি। 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের এক মহত্তম সৃষ্টি - গোরার স্বদেশচেতনা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার প্রতিফলন। 'ঘরে

বাইরে' উপন্যাসের সন্দীপ ও নিখিলেশ চরিত্রের মধ্যে দুই পরস্পর বিরোধী চরিত্রের সৃষ্টি করে স্বদেশ প্রেমের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ ও অতীন চরিত্রের মধ্যস্থতায় দেখিয়েছেন জোর করে কাউকে স্বদেশ প্রেমে দীক্ষিত করা যায় না, স্বদেশ প্রেমের চেয়ে বড় মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থী মতকে সমর্থন করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রমথনাথের ভাষাগত তুলনা এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের 'করুণা' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত উপন্যাসের ভাষায় আবেগ উচ্ছ্বাস বর্ণনাকে পল্লবিত করবার প্রবণতা ও অলঙ্কার বহুল ভাষা। 'চোখের বালি'তে আবেগ উচ্ছ্বাস নেই বর্ণনা অনেকটা সংযম ও অলঙ্কার বাহুল্যতা নেই। 'গোরা' তৎসম শব্দের ধ্বনি গাম্ভীর্য অসমাপিকার ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি, 'চতুরঙ্গে' সাধুগদ্যের ঐতিহ্যকে নতুন ভাবে নির্মাণ করলেন ভাষা গুরুচন্ডালী হলেও বাক্য শেষ করলেন অসমাপিকা ক্রিয়ায়। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের রাজপ্রাসাদে স্থান দিলেন। জীবনের গভীরতা এখানে প্রকাশিত। 'শেষের কবিতায়' সমুজ্জ্বল ও প্রাণোচ্ছল ভাষা বুদ্ধি, কল্পনা ও কথার ফুলঝুরি এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে।

পাশাপাশি প্রমথনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাসে বর্ণনা ও বিশ্লেষণে কাব্যধর্মে সাধুরীতি এবং সংলাপ অংশে চলিত রীতি ব্যবহৃত হলেও স্বাধীনতা উত্তর উপন্যাসগুলিতে সংলাপ ও বর্ণনা অংশে চলিত রীতিকেই সুষমভাবে প্রয়োগ করেছেন। ভাষার ব্যাপ্তি ও কাব্যগুণ অনেকটা রবীন্দ্র প্রভাবিতএতে কোন সন্দেহ নেই।

পরিশেষে বলা যায় প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রচনাধারার স্বাতন্ত্র্য থাকলেও কাব্যধর্মীভাষা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, স্বদেশ চেতনা, নরনারী চরিত্র উপস্থাপনায়

রবীন্দ্রানুগত্যকে অনেক ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন। তবুও কথা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমথনাথ সম্পূর্ণ একক ও অনন্য।

প্রমথনাথ বিশী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রমথনাথ বিশী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দুজনেই রবীন্দ্র সমকালীন লেখক এবং দুজনেই রবীন্দ্রস্নেহধন্য। কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনের সঙ্গে দুজনেই শিক্ষাসূত্রে যুক্ত অথচ শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে দুজনেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। প্রমথনাথের সাহিত্য চর্চার প্রথম সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনের উদার প্রকৃতির কোলে ঠিক তেমনি প্রভাতকুমারও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ঃ-

" রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই।... ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, গদ্য রচনার জন্য প্রধান জিনিস হইতেছে রস।" [১]

প্রমথনাথের উপন্যাস বৈচিত্র্যময়, সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর জটিল প্রেক্ষাপট প্রমথনাথের কথাসাহিত্যের উপাদান। এখানে ইতিহাসচেতনা, সমাজচেতনা, ধর্মচেতনা প্রতিটি দিক বর্ণিত হয়েছে। প্রমথনাথের উপন্যাসে কৃষিসভ্যতার সূত্রপাত, রাজতন্ত্রের পরাজয়, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও কোম্পানী শক্তির উত্থান, অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের কলকাতার সমাজজীবন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকেন্দ্রিক

উপন্যাস প্রমথনাথ লিখেছেন অপরদিকে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার সুর ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভূক্তির দাবী রাখে তাঁর রচনায়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শিল্পীহৃদয় পরিপূর্ণ ছিল মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায়। মর্ত্যজীবনের প্রতি ভালোবাসার অভাব ছিল না তাঁর কথাসাহিত্যে। তাঁর শিল্পদৃষ্টি ছিল বিশিষ্ট জীবনবোধে সেখানে জটিলতাহীন সজীব ও রসোজ্জ্বল শিল্পীজগৎ গড়ে তুলেছেন। প্রভাতকুমারের উপন্যাস চৌদ্দখানিতে এই বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে — 'রমাসুন্দরী'(১৯০৮), 'নবীন সন্ন্যাসী'(১৯১২), 'রত্নদীপ'(১৯১৫), 'জীবনের মূল্য'(১৯১৭),'সিঁন্দুর কৌটা'(১৯১৯),'মনের মানুষ'(১৯২২),'আরতি'(১৯২৪), 'সত্যবালা'(১৯২৫),'সুখের মিলন'(১৯২৭), 'সতীর পতি'(১৯২৮),'প্রতিমা'(১৯২৯), 'গরীব স্বামী'(১৯৩৮), 'নবদুর্গা'(১৯৩৮), 'বিদায়বাণী'(১৯৩৩)।

আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে প্রেম, বাৎসল্যরস, একান্নবর্তী পরিবারের কথা, মানবজীবনের বৈচিত্র্য ও স্নিগ্ধ পল্লীর সুখ দুঃখের জীবন কাহিনী হাসির আলোয় ভোলাতে চেয়েছেন প্রভাতকুমার। তাঁর রচনায় সমকালীন রাজনৈতিক জীবন, সমাজজীবন, স্বদেশী আন্দোলন, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে রসোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসে আধুনিক যুগযন্ত্রণা প্রভাবিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নেই আছে পল্লীজীবন ও নগরজীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাতহীন জীবনের আলেখ্য। তিনি জীবনের উপরিতলচারী হাসি কান্নার সুদক্ষ রূপকার। কৌতুক ও রঙ্গরসের সিদ্ধ শিল্পী।

প্রমথনাথের উপন্যাসে পল্লীজীবনের কথা আছে। 'পদ্মা', 'কোপবতী', 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'জোড়াদীঘির উদয়াস্তে'র চরিত্র ও ঘটনা পল্লীকেন্দ্রিক। জমিদার, বাদশা, স্বদেশ প্রেমিকদের জীবনকথা প্রমথনাথের সাহিত্যে অভিনব শিল্পকর্মরূপে চিত্রিত হয়েছে।

প্রমথনাথ ব্যঙ্গরসিক শিল্পী বিশেষত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রঙ্গব্যঙ্গ স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও উপন্যাসের জগতে হাস্যরসের অভাব নেই। হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রমথনাথ ডিকেন্সের অনুসারী। প্রভাতকুমারের উপন্যাসের হাস্যরস কোন ধারার তা নিয়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। প্রমথ চৌধুরী প্রভাতকুমারের উপন্যাসকে মোপাঁসার অনুসারী বলে অভিমত জানালেও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর উপন্যাস ডিকেন্সের আদর্শে লিখিত হয়েছে। কাজেই হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুজনেই ডিকেন্সের অনুসারী। প্রমথনাথের মহাকাব্যিক 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তরবাংলার রাজসাহী ও পাবনা জেলার সমাজচিত্র এঁকেছেন তাতে উদ্ভট ও উৎকেন্দ্রিক চরিত্র পাঠকমনে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে ছিদাম বহুরূপী, বোবা আববর ও তার মুখর দাঁড়কাক এবং পুঁটি গোয়ালিনী প্রণয়ী, সংস্কৃত কাব্যরসের মাধ্যমে আদি রসাত্মক চরিত্র বাণীবিজয়, বেঙা চৌকিদার, রমেশঢুলি প্রভৃতি চরিত্রগুলি হাস্যরস ও উদ্ভট রস সৃষ্টি করে পাঠকমনে নির্মল আনন্দ দান করেছে। সমকালীন হাস্যরসশিল্পীদের সঙ্গে প্রমথনাথের মনের মিল থাকলেও তাঁর কবিদৃষ্টি ও জীবনবোধ অনেক ক্ষেত্রে জীবনের ট্র্যাজেডি মহিমা বিষন্ন মধুর আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

প্রভাতকুমারের সাহিত্যে দেখা যায় যে তাঁর উপন্যাসগুলির শুরুতে নিষ্ঠুর বা করুণ হলেও পরিণামে রমণীয়তা লাভ করেছ এবং মধুর রসের আবেদন সৃষ্টি করেছে। প্রভাতকুমারের সাহিত্যে তাই ট্র্যাজেডি বা গভীর বেদনা ও দুঃখযন্ত্রণা নেই। প্রমথনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের এখানেই পার্থক্য। প্রমথনাথের দৃষ্টি যেখানে ডুব দিয়েছে হৃদয় রহস্যের অতলে সেখানে প্রভাতকুমার হৃদয়কে দূর থেকেই দেখেছেন।

প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যবর্তী সাহিত্যিক তেমনি সাহিত্য প্রকৃতির দিক থেকেও তিনি দুজনের মধ্যবর্তী। রবীন্দ্র সাহিত্যে রূপ থেকে রূপাতীতে, খন্ড থেকে অখন্ডে, সীমা থেকে অসীমের প্রতি ব্যঞ্জনা ও আনন্দের জগৎ অপরদিকে শরৎচন্দ্রের মধ্যে আছে আমাদের পারিবারিক জীবন ও সমাজজীবন জিজ্ঞাসা যেখানে জটিলতা, ভাবালুতা, অশ্রুসজল কাহিনী মূল উপজীব্য। প্রভাতকুমারের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের বর্ণনা নেই, আবার শরৎচন্দ্রের সমাজসংস্কার ও অশ্রুসজলতাও নেই। জীবনের অতুল ঐশ্বর্যের ছটা প্রভাতকুমারের সাহিত্যে নেই - আবার জীবনের জটিলতাও নেই - প্রভাতকুমার মধ্যপন্থী। প্রচলিত সমাজ ও সামাজিক নীতিধর্মের প্রতি তাঁর সমর্থন নেই আবার আধুনিক সমাজজীবনের বিরুদ্ধে তার কোন বিদ্রোহ নেই।

প্রমথনাথ ও প্রভাতকুমারের ব্যাপক জীবন প্রীতি ও বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতা বিচিত্রধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। সামাজিক উপন্যাসগুলোতে প্রমথনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের ঐক্য আছে। দুজনের উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা রাজা মহারাজা থেকে শুরু করে অজ্ঞাত. কুলশীল মানব, মানবী। দুজনেই দরদী ও সহানুভূতিশীল লেখক। তবে প্রভাতকুমার মনে মনে রক্ষণশীল প্রমথনাথের মতো অতীত ঐতিহ্যে বিশ্বাসী।

প্রমথনাথের উপন্যাসগুলিতে আপাত নিষ্ঠুর ও করুণ রমণীয় হলেও পরিণামে ট্র্যাজেডি বা গভীর বেদনা ও দুঃখ দিয়েই পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আর প্রভাতকুমারের উপন্যাসের পরিণতি কারুণ্য মিশ্রিত নয় মধুর রসসিক্ত।

বস্তুতঃ প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তার মূলে তার কৌতুকপ্রিয়তা। তাঁর কথাসাহিত্য মূলতঃ পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জনের অন্যতম ক্ষেত্র। প্রভাতকুমারের প্রথম সফল সৃষ্টিমূলক উপন্যাস 'রমাসুন্দরী'র ভৌগোলিকপটভূমি কাশ্মীর। অথচ কাশ্মীরের অনবদ্য

বর্ণনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে বই পড়ে লেখা তবুও এই বর্ণনা মনে হয় সদ্য কাশ্মীর ভ্রমণের নিখুঁত বিবরণ।

প্রভাতকুমার কাশ্মীরে যায় নি - রবীন্দ্রনাথ উত্তরে জানিয়েছেন —

" তুমি যাও নাই! - এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পড়িলে মনে হয় স্বচক্ষে দেখিয়া এসব লিখিয়াছ।"[২]

প্রমথনাথের 'কেরীসাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের চন্ডী বক্সী ও 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের বেঙা চরিত্রের সঙ্গে প্রভাতকুমারের 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের গদাই পাল চরিত্রটি সমগোত্রের। তাদের অদ্ভূত কৌশল, ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার, জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য অসাধু নীতি, নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনক্ষমতা চরিত্রসৃষ্টির অনন্য সাধারণ নিপুণতা দেখিয়েছেন দুজন শিল্পীই। দুজনের কলমেই চরিত্রগুলি সজীব ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথের 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের ভট্টাচার্য ও বাণীবিজয় চরিত্রের চাটুকারবৃত্তির সূক্ষ্ম কারুকার্য, উদ্ভট সংস্কৃত শ্লোক প্রিয়তার সঙ্গে প্রভাতকুমারের 'জীবনের মূল্য' উপন্যাসের সতীশ দত্ত চরিত্রের ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়।

জন্মরোমান্টিক প্রভাতকুমারের উপন্যাসে কাব্যধর্ম ও নাট্যগুণের অভাব নেই। তবে 'রমাসুন্দরী' উপন্যাসে যে নিসর্গচিত্র ণ আছে তা অনেকটা কাব্যধর্মী। যা প্রমথনাথের 'পদ্মা' ও 'কোপবতী'র প্রকৃতিবর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়।

প্রভাতকুমারের 'রত্নদীপ' উপন্যাসের পাপ পুণ্যবোধের সঙ্গে রুমালী ও কঙ্কণের পাপ পুণ্য বোধের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রমথনাথের সঙ্গে প্রভাতকুমারের পার্থক্য হল প্রভাতকুমারের উপন্যাসের উপযুক্ত

ব্যাপ্তি, অবিচ্ছিন্ন সংহতি ও বিশ্লেষণ গভীরতা নেই। প্রমথনাথের উপন্যাসের মহাকাব্যের ব্যাপ্তি, সংহতি ও বিশ্লেষণ গভীরতা বর্তমান।

প্রভাতকুমারের প্রসন্নতা ছিল শহরবাসী শিক্ষিতের উপর এবং অপ্রসন্নতা পল্লীজীবনের প্রবীন কুচক্রীর প্রতি। নারীর প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করেছেন তিনি। অপরদিকে প্রমথনাথের প্রসন্নতা গ্রাম্য চরিত্রের প্রতি, নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিমতা লেখক পছন্দ করেন নি।

প্রমথনাথের উপন্যাসের চন্ডীবক্সী, মোতিরায়, বনোয়ারীলাল চরিত্রগুলি তাদের দৃষ্টিতেই দেখেছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ধরণের চরিত্রগুলির পরিণতি ঘটেছে কারুণ্যের মধ্যে দিয়েই। প্রভাতকুমারের উপন্যাসে খলচরিত্র আছে অদ্বৈত, বদনচন্দ্র কিন্তু তাদের প্রতি বিরূপতা না দেখিয়ে তাদের দৃষ্টিতেই দেখেছেন বলে চরিত্রগুলি বাংলা কথাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

প্রমথনাথের ভাষা প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। সরল প্রাঞ্জল ভাষার সঙ্গে উপমা, রূপক, শ্লেষের আধিক্য। প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলি ভাষা কাব্যধর্মী তৎসম শব্দবহুল সাধুরীতি এবং সংলাপ অংশে চলিতরীতির বর্ণনা ও ভাবের বাহন উপযোগী ভাষা ব্যবহার প্রমথনাথের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য। প্রভাতকুমারের রচনারীতি অনেকটা সরল। ভাষা কথ্য না হলেও চলিত ঘেষা আবার তৎসম শব্দের অবাধ প্রয়োগ।

পরিশেষে বলা যায় প্রমথনাথ ও প্রভাতকুমার দুই স্বতন্ত্র ধারার লেখক তবুও হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রমথনাথ বিশী ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রমথনাথ বিশী ও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব কালের ব্যবধান পঁচিশ বছর হলেও দুজন লেখকের সাহিত্য স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল আবার তাঁদের মধ্যে আধুনিক কথাসাহিত্যের আধুনিক চেতনার লক্ষণগত সৌসাদৃশ্যের অভাব নেই। কথাশিল্পী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ' যুগপরিক্রমায় ' শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন -

'' তিনি শুধু আলো আঁকেন নাই, ছায়াও আঁকিয়াছেন, আর ছায়ার ভিতর আলোর সন্ধান দিয়াছেন। ''[৩] একথা প্রমথনাথ বিশী সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য।

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সামান্য জীবনের অসামান্য রূপকার, দরদী কথাশিল্পী কথাসাহিত্যের ভুবনে শুধুমাত্র ভারতেই নয় সমগ্র বিশ্বে তিনি জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে বাস্তব অভিজ্ঞতা, সমাজসচেতনতা, গভীর হৃদয়ানুভূতি, করুণা ও তার রোমান্টিক ভাবাবেগ গুণে গ্রাম কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত মানসিকতা আভিজাত্য ও উচ্চবিত্তের প্রবর্তিত মূল্যবোধ ভেঙ্গে ফেলে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে ডুব দিয়েছেন ।

প্রমথনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে যে প্রশ্নটি প্রথমে আসে তা হল কে কোন শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করেছেন । প্রমথনাথের দুটি মাত্র সামাজিক উপন্যাস, বাকী উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের জীবনচর্চা কামনা বাসনা, আশা নিরাশা ও সুখদুঃখ, আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশপ্রেম প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ধারাবাহিক ইতিহাসচর্চা প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। অপরদিকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পারিবারিক ও সামাজিক, একমাত্র 'পথেরদাবী' উপন্যাসটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত।

প্রমথনাথের উপন্যাসে ভৌগোলিক পটভূমি তাঁর জন্মভূমি কেন্দ্রিক উত্তরবঙ্গ, রাঢ়বঙ্গ, কলকাতা ও দিল্লী। এক চতুর্থাংশ শহরকেন্দ্রিক বাকীটা পল্লীকেন্দ্রিক। কল্লোলযুগের পল্লীপ্রীতিই প্রমথনাথের উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অপরপক্ষে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের 'বড়দিদি'র' ঘটনাস্থল কলকাতা শহর, 'বিরাজবৌ' এর দেবানন্দপুর অঞ্চলের সপ্তগ্রাম, 'পরিণীতার' কলকাতা শহর, 'পন্ডিতমশাই' এর ধারল গ্রাম, 'পল্লীসমাজের' এর কুঁয়াপুর, 'চন্দ্রনাথে'র কাশী, 'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি' র ভৌগোলিক পটভূমি গ্রামাঞ্চল, 'বৈকুন্ঠের উইল' এর বাবুগঞ্জ, 'চরিত্রহীনে'র কলকাতা ও রেঙ্গুন, 'একাদশী বৈরাগী'র কালীদহ গ্রাম, 'পথের দাবীর' রেঙ্গুন, 'গৃহদাহ' কলকাতার, 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের পটভূমি বীরভূম জেলার গঙ্গামাটি গ্রাম, 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি বার্মা।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মূল সমস্যা দেহ ও মনের সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাঙন, প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ এবং গৌণ সমস্যা প্রেম। প্রমথনাথের উপন্যাসের মূল সমস্যা যুগজীবনের দ্বন্দ্ব, জমিদারী প্রথার ভাঙন ও দেহ ও মনের সম্পর্ক এবং গৌণ সমস্যা প্রেম।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পটভূমির অর্ধাংশ গ্রাম বাকী অর্ধাংশ কলকাতা, বাংলার মফঃস্বল, পশ্চিম ও বার্মা। কাজেই শরৎসাহিত্যে শহরের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং গ্রাম্যপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি গ্রামকে রাম বলে শহরকে হারাম বলেননি। তবে গ্রামীণ ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজ ও জমিদার শাসিত সমাজকে যেভাবে দেখেছেন তাই শরৎ সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে' ও 'পন্ডিত মশাই' এ গ্রামীণক্ষুদ্রতা, কলহপরায়ণতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার পুঙ্খানুপুঙ্খ

বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রমথনাথের ঐতিহ্যপ্রীতি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে জমিদারদের অবক্ষয়, মোঘল বাদশার পরাজয়, ইংরেজ শক্তির উত্থান এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রমথনাথের উপন্যাসের মূলথীম। 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত', 'লালকেল্লা', 'বঙ্গভঙ্গ', 'পনেরোই আগষ্ট' এই ধারার উপন্যাস। 'পদ্মা', 'কোপবতী'র মূলবিষয় প্রেম ও প্রকৃতি।

শরৎচন্দ্র সমকালীন সমাজ বাস্তবতার অন্যতম রূপকার। তাঁর গ্রামীণ সমাজের পটভূমিতে জমিদারী শোষণ অত্যাচার ব্রাহ্মণ্য কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি বিভিন্ন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আর শহর জীবনে একদিকে দেশপ্রেম, সমাজসংস্কার অন্যদিকে সুরাসক্তি ও পতিতাদের প্রতি আসক্তি ছিল প্রবল। বিধবা বিবাহ আইনসম্মত হওয়া সত্বেও বালবিধবা নারীরা ছিল লাঞ্ছিতা। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা ছিল অবহেলিত অথচ শরৎচন্দ্র নারীদের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল - সতীত্বের ব্যাখ্যা তিনি নূতন ভাবে দিয়েছেন। তৎকালীন সমাজপতিদের বীভৎসরূপ তিনি দেখিয়েছেন। সমাজকে তিনি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। অন্ধকুসংস্কার যুক্ত প্রচলিত নীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে উপলব্ধি করে তিনি একে একে প্রশ্ন করেছেন — সতীত্ব কী ? সমাজ কিসের নাম ? কার দাস ? নারীত্বের সংজ্ঞা কি ? চরিত্রবান কে ? মনুষ্যত্ব বলতে আমরা কি বুঝি ? ' চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এই প্রশ্নই দেখা দিয়েছে।

প্রমথনাথের নায়ক নায়িকারা শরৎচন্দ্রের মতো সাধারণ মানুষ শতকরা ৯৯ জনের মধ্যে একজন প্রতিনিধি। মাধবী, যোগেন্দ্রনাথ, বিরাজ, বৃন্দাবন, কুসুম, রমা, রমেশ, চন্দ্রনাথ,

সরযূ, জ্ঞানদা, শ্রীকান্ত, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, অভয়া প্রভৃতি শরৎচন্দ্রের নায়ক নায়িকারা সাধারণ শ্রেণীভূক্ত। প্রমথনাথের জীবনলাল, রুমালী, তুলসী, কঙ্কণ, বিনয়, বিমল, ফুল্লরা প্রত্যেকেই সাধারণ শ্রেণীভূক্ত।

প্রমথনাথের উপন্যাসে জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী, বিত্তবান, সৈনিক, পন্ডিত, মহাজন, নায়েব, গোমস্তা, পোষ্টমাস্টার, শিক্ষক, সাধারণগৃহস্থ, চাষী, রাজমিস্ত্রী, মাঝি, পুরোহিত প্রভৃতি হল গ্রামীণ নরনারীগণের পেশাগত পরিচয়।

শরৎসাহিত্যে গ্রামীণ নরনারীগণের মধ্যে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী, বিত্তবান, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন, কৃষক ও ভূমিহীন প্রজা মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে।

প্রমথনাথের সাহিত্যে নাগরিক নরনারীগণের পেশাগত পরিচয় অধ্যাপক, রাষ্ট্রনেতা, চিকিৎসক, বাবু, প্রকাশক, আইনজীবি, ইংরেজ চরিত্র প্রধান।

শরৎসাহিত্যের নাগরিক নরনারীগণের পেশাগত পরিচয় হল অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, কেরানী, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, আইনজীবি, শিল্পী ও বারাঙ্গনা চরিত্রেই উল্লেখযোগ্য।

প্রমথনাথের উপন্যাসের নায়কচরিত্র গুলো প্রায় প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত। বিমল, বিনয়, নীপেশবাবু, নবীননারায়ণ, জীবনলাল প্রত্যেকেই এম.এ.।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়করাও উচ্চশিক্ষিত। 'চরিত্রহীন', উপন্যাসের উপেন্দ্র এম.এ, 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথ এম.এ, 'চন্দ্রনাথে'র চন্দ্রনাথ এম.এ পাশ। বিলাত ফেরৎ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চরিত্রের মধ্যে সব্যসাচী, নরেন, বিপ্রদাস, অরুণ, অজিত, আশুবাবুরা প্রত্যেকেই ভারতীয় আদর্শকে উপেক্ষা করেনি। শরৎসাহিত্যে পুরুষ চরিত্রগুলো বেশিরভাগ ভবঘুরে, নিঃস্ব, অনাথ, জীবিকাহীন ও ছাত্র। প্রমথনাথের 'পদ্মা' উপন্যাসের বিনয় জীবিকাহীন, 'কোপবতী' উপনাসের নায়ক বিমল জীবিকাহীন চরিত্র।

প্রমথনাথের উপন্যাসের নায়িকারা স্বল্পশিক্ষিত একমাত্র ব্যতিক্রম মুক্তামালা। এছাড়া কঙ্কণ, সীতা, ফুল্লরা, ইন্দ্রাণী, রেশমী, বনমালা, রুক্মিণী কেউই উচ্চশিক্ষিতা নন, স্কুল অবধি তাদের লেখাপড়া।

শরৎসাহিত্যে উচ্চশিক্ষিতা নারীর অভাব নেই। ইংরেজী ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে কিরণময়ী, সরোজিনী, ললিতা, অচলা, অভয়া, হরিলক্ষ্মী, সবিতা, সারদা, ইন্দুমতী, কমলা, সুচিত্রা, ভারতী, মনোরমা , বিজয়া, নলিনী উল্লেখযোগ্য।

শরৎচন্দ্র আধুনিকা নায়িকাদের পাশাপাশি সনাতন পরিবারের কল্যাণময়ী প্রতিমা অঙ্কন করেছেন। অচলা, কিরণময়ী আধুনিকা ও মৃণাল সুরবালা চরিত্র সনাতন মূল্যবোধের প্রতীক।

প্রমথীয় সাহিত্য ও শরৎ সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট। অবদমিত আসঙ্গলিপ্সা, মগ্নচৈতন্যের নিরুদ্ধ কামনা, পাপবোধ, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব, ছিন্নমূল অনিকেত, অস্থির উদ্বেগ, নিঃসঙ্গতাবোধ, ভয়ানক ও বীভৎসরসের প্রাধান্য ও রোমান্টিকতা। এছাড়া শরৎ সাহিত্যে কল্লোল যুগের বিদ্রোহ, প্রগতিচিন্তা, নগরচেতনা, পল্লী চিত্র রূপায়িত হয়েছে। বলাবাহুল্য কল্লোলযুগে শরৎ সাহিত্যের প্রভাব ছিল ব্যাপক।

প্রমথনাথের সাহিত্যে বাঈজী চরিত্র হিসেবে পান্না, খুরশিদজান, রুমালীর নাম করা যেতে পারে । বারাঙ্গনা চরিত্রের মধ্যেও যে ভালোবাসা আছে তারাও দয়িতকে অবলম্বন করে সংসার জীবনে যেতে আগ্রহী তার প্রমাণ রুমালী চরিত্র।

শরৎচন্দ্র পতিতা চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল। 'শ্রীকান্তের' পিয়ারী বাঈজী, রাজলক্ষ্মী, 'দেবদাস' এর চন্দ্রমুখী সমাজ উপেক্ষিতা হলেও তাদের প্রেমকে শরৎচন্দ্র উপেক্ষা করেন নি। সমাজে বালবিধবা স্বামী পরিত্যক্তা রাজলক্ষ্মী সসম্মানে বেঁচে থাকতে

না পেয়ে বাঈজী জীবনকে বেছে নিয়েছে। আবার সিপাহীদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে দুধবিক্রেতা রুমালী বারাঙ্গনার ভূমিকা পালন করেছে। পান্নাবাঈ নৃত্যগীত রূপোপজীবিনী হলেও ঈশ্বরে ভক্তি ছিল তার অকৃত্রিম। রাজলক্ষ্মী বাঈজী হলেও পান্নার মত আচার আচরণ ও সংস্কারকে মেনে নিয়েছে। পিয়ারীবাঈ পরোপকারী, ছেলেকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছে, সতীনের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। তবুও সমাজে তার স্থান নেই। 'দেবদাসে' চন্দ্রমুখী বারবণিতা হলেও দেবদাস তাকে ভালবেসে মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছে। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন পতিতা নারীদেরও হৃদয়ানুভূতি আছে তাদের প্রতি অপরিসীম দরদ শরৎসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

প্রমথনাথের বিদ্রোহিণী নারী চরিত্র সীতা, কঙ্কণ, রেশমী, রুমালী, চাঁপা মলিনা তেমনি শরৎসাহিত্যের বিদ্রোহিণী নারী চরিত্র কিরণময়ী, অভয়া নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। কিরণময়ী ও চাঁপা দুজনেই উন্মাদিনী হয়েছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে কুলত্যাগিনী চরিত্র রেশমী সহমরণ থেকে পলাতকা। শরৎসাহিত্যে অন্নদাদিদি, সাবিত্রী, বিরাজ কুলত্যাগিনী চরিত্র সমাজ তাদের ব্যাভিচারিণী বলে আখ্যা দিয়েছে।

প্রমথনাথের 'চলনবিল' উপন্যাসের কুসমি ও 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের সহমরণ থেকে পলাতকা নারী চরিত্র রেশমী তাদের জীবনে প্রেম এসেছিল। কুশমি মোহনের বাল্যপ্রেম, জন ও রেশমীর প্রেমে সুখ অপেক্ষা দুঃখভোগ বেশি ছিল। রেশমী ও জনের বিবাহ হয়নি অথচ তাদের দেহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । একজন ইংরেজ ও বাঙ্গালী মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মটাই প্রধান বাধা। প্রমথনাথ বালবিধবা কুসমির সঙ্গে মোহনের বিয়ে দিতে পারেন নি, জনের সঙ্গে রেশমীর বিবাহ দিতে পারেন নি। অথচ হিন্দুসমাজে

বিধবা বিবাহ ছিল সমর্থিত।

শরৎচন্দ্রের 'পথনির্দেশের' হেমনলিনী, 'শ্রীকান্তে'র, রাজলক্ষ্মী, 'বড়দিদি'র মাধবী, চরিত্রহীনের সাবিত্রী, 'পল্লীসমাজে'র রমা সকলেই বিধবা তারা তাদের প্রেমিক কে হৃদয়দান করেছিল, মন প্রাণ সমর্পণ করেছিল তাদের প্রণয় বেদনাকেসহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন শরৎচন্দ্র। তাদের প্রতি লেখকের সমবেদনা থাকলেও রক্ষণশীল ও আদর্শবাদী শরৎচন্দ্র তাদের বিয়ে দিতে পারেন নি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে।

প্রমথনাথের সাহিত্যে সেবাপরায়ণা নারীর অভাব নেই। 'লালকেল্লা' উপন্যাসের তুলসী, রুমালী,' পদ্মা ' উপন্যাসের কঙ্কণ, 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের বনমালা, 'পদ্মা' উপন্যাসের সর্বেশ্বরী, 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসের নিস্তারিনী ও বিন্দুবাসিনী প্রত্যেকেই সেবাপরায়ণা নারী। খাওয়ানোর ব্যাপারে তাদের যত্নের তুলনা হয় না।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নারীরা সেবাপরায়ণা ও কল্যাণীর প্রতিমূর্তি। বাঙালীর গৃহজীবনে তাদের মধুর ব্যক্তিত্বটিকে শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন পরম সহানুভূতির সঙ্গে।

প্রমথনাথের 'লালকেল্লা' উপন্যাসের নায়ক জীবনলালকে কেন্দ্র করে পান্না, রুমালী, তুলসী এই ত্রয়ী নারীর আবির্ভাব ঘটেছে। তেমনি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের শ্রীকান্তকে কেন্দ্র করে অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী ও অভয়ার প্রেম শ্রীকান্তের যাযাবর জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্থাপন করে এক মননশীল জীবন দর্শন গড়ে তুলেছে।

প্রমথনাথের 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে জমিদারদের শরিকদের দ্বন্দ্ব আছে। নবীননারায়ণ ও কীর্তিনারায়ণের দ্বন্দ্ব, 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে দর্পনারায়ণ ও পরন্তপ দুই জমিদারের লড়াই, কলকাতার বাবু মোতিরায় ও মাধবরায়ের মধ্যে জ্ঞাতি হিংসার কদর্যরূপ প্রমথনাথ বাস্তবসচেতনভাবে দেখিয়েছেন। শরৎসাহিত্যেও

গ্রামীণ জমিদারদের প্রাণঘাতী শরিকিদ্বন্দ্ব আছে। শত্রুকে পরাস্ত করবার জন্য হীন ষড়যন্ত্রের জাল বোনে - শত্রুকে বিপদে ফেলবার জন্য যে কোন পন্থাকেই বেছে নেয় জীবানন্দ চৌধুরী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জমিদার বা শাসকের সহযোগী শয়তান কুচক্রী নায়েব এককড়ি নন্দী, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সর্বেশ্বর, তারাদাস, ধনী জোতদার জনার্দন, হীন, লোভী ও স্বার্থপর গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরান হালদার, দীনু ভট্টাচার্য, ধর্মদাস মুখুজ্জে, ষড়যন্ত্রী শোষক বেণী ঘোষাল যারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হেন কাজ নেই করেনি। এধরণের টাইপচরিত্র প্রমথনাথের সাহিত্যে অভাব নেই চন্ডীবক্সী, তিনু চক্রবর্ত্তী, বনোয়ারীলাল সমগোত্রের।

প্রমথনাথের 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের জোড়ামউ গ্রামের চন্ডীবক্সীর কপট ষড়যন্ত্র ও শোষনস্পৃহা, রেশমীর সম্পত্তিকে গ্রাস করবার প্রয়াস , শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের বেণী ঘোষাল চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' এর পরন্তপ চরিত্রের সঙ্গে দোর্দন্ড প্রতাপ জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর (দেনাপাওনা) শোষণ, নিপীড়ন ও অধঃপতনের সঙ্গে তুলনীয়।

আবার 'চলনবিল' উপন্যাসের নায়ক দর্পনারায়ণের সঙ্গে 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের জীবানন্দ চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অধঃপতনের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে জীবানন্দের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে। তার প্রতিফলন ঘটেছে সাধারণ কৃষক, প্রজাদের সুবিধার জন্য জীবানন্দ ও গ্রামবাসী কর্তৃক কৃষিযোগ্য মাঠে ব্রীজ নির্মাণ কিংবা রাত জেগে জেগে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে। যে জীবানন্দ ছিল অত্যাচারী, শোষক সে এখন হয়েছে শোষিতের বন্ধু। শ্রেণী শোষণের পরিবর্তে শ্রেণী সামঞ্জস্য দেখা গেছে। ঠিক তেমনি দর্পনারায়ণ শোষক না হলেও সে 'চলনবিল' উপন্যাসে গ্রামের রক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে, চলনবিল এলাকায় গ্রামবাসীদের নিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তিন তিনটি বাঁধ

নির্মাণ করেছে - কৃষকদের জীবনের শরিক হয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছে যদিও পরিণতিতে বন্যার জলোচ্ছ্বাসে তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার পাঠকসমাজকে চমকিত করে দিয়েছে। 'কোপবতী' উপন্যাসে মিশকির কালো পাথর প্রদান নায়িকা ফুল্লরাকে প্রভাবিত করেছে, বেণীরায়ের ভিটার জাগ্রত ডাকাত কালীমন্দির, চন্ডীমন্ডপ, জনের মাদুলী সংগ্রহ রেশমীকে লাভ করবার জন্য, বাস্তু সাপ, ভূতের প্রসঙ্গ ইত্যাদি ভৌতিক ভীতি ও তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব রয়েছে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তন্ত্রমন্ত্র, ভৌতিক ভীতি, সাঁপুড়ের ঝাড়ফোক, বাটি চালান দিয়ে সাপ ধরবার ঘটনা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথের ভারতের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস 'দেশের শত্রু', 'বঙ্গভঙ্গ', 'পনেরোই আগষ্ট' এ রাষ্ট্রনেতাদের ভূমিকার উল্লেখ আছে। দিনাজশাহী শহরের কয়েকটি পরিবার নিয়ে 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' রচিত। প্রমথনাথের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে যোগ ছিল না একথা বললে হয়তো অবিচার করা হবে। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের বিশ্বাসী বলেই তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করেন নি। অথচ তাঁর উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদের পরিচয় আছে গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র, চরমপন্থীদের কার্যকলাপ ও দেশবাসীর স্বাধীনতা আকাঙক্ষার মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা লাভ হয়েছে 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে এটাই বলতে চেয়েছেন প্রমথনাথ। তিনি এক্ষেত্রে পুরোপুরি বাস্তববাদী নন কিছু কাল্পনিক চরিত্রকেও উপন্যাসে এনেছেন।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক উপন্যাস। পরাধীনতার যন্ত্রণা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে স্বদেশ প্রেমের জ্বলন্ত

দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। শরৎচন্দ্র ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন, তবুও তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকারীদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন। গান্ধীবাদে আস্থা ছিল না বলেই তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়েছেন। এই উপন্যাসের সব চরিত্রই বাস্তবধর্মী - কাল্পনিক কোন চরিত্র নেই একারণেই শরৎচন্দ্র এখানে বাস্তববাদী। সব্যসাচী এই উপন্যাসের নায়ক কারখানায় কারখানায় ঘুরে শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। রাজদ্রোহী সব্যসাচী ভারতের স্বাধীনতা লাভকে জীবনের মূলমন্ত্র রূপে বেছে নিয়েছেন। তার সাধনা হল হয় মৃত্যু নয় ভারতের স্বাধীনতা। সাত আটটি ভাষায় দক্ষ বহু ডিগ্রী প্রাপ্ত স্বদেশপ্রেমিক সব্যসাচীকে যে কোন মূল্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গ্রেপ্তার করতে চেয়েছে, বারবার ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে তার কর্মপ্রবাহ দেশে বিদেশে অব্যাহত গতিতে চালিয়েছে। সব্যসাচী কৃষক শ্রেণীর উপর আশাবাদী ছিলেন না। তার মতে বিপ্লব মানে সমাজের আমূল পরিবর্তন কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা নয়। তাঁর দেশ প্রেমের সঙ্গে যুক্ত ছিল দেশের কুসংস্কার, মিথ্যাচার, জাতিভেদ ও নারীর অমর্যাদার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। ভারতী, অপূর্ব তারাও পথের দাবীর সভ্য হয়ে দেশাত্ববোধক কাজ করেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার অভিযোগে 'পথের দাবী' উপন্যাসটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

এবারে প্রমথনাথের ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনগত দিকের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। শরৎসাহিত্যের প্লট গৌণ, থট্ এবং চরিত্রকে মুখ্য স্থান দিয়ে কল্লোলিয়ানগণের আদর্শ তৈরী হল। এই পথেই কল্লোলযুগের সাহিত্যিকরা এগিয়ে গেছেন। ঘটনা প্রধান উপন্যাসকে, চরিত্র প্রধান উপন্যাসকেগুরুত্ব দিলেন। প্রমথনাথ

ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে লিখেছেন —

" প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র - তাকে ফোটাবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করতে হয়।"[৪]

অপরদিকে প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস ঘটনাপ্রধান, তবে তিনি চরিত্রের উপর গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। প্রমথনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কৌতুকরস পরিবেশনের ক্ষেত্রে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। প্রমথনাথের বোবা আব্বর, পুঁটি গোয়ালিনী, পুরোহিত ভট্টাচার্য, বাগ্মীবিজয়, গোপালের বাঁশী চুরি, অবিনাশবাবুর নাট্যপ্রিয় পুত্র, বারোয়ারী তলার চন্ডী বক্সী ও তিনুর লড়াই, বেঙা, ন্যাড়া প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মেজদা, - ব্যবসায়ী গুরুজী, নতুনদা, শ্রীনাথ বহুরূপী প্রভৃতি চরিত্রে কৌতুকরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

প্রমথনাথের কাহিনী সংগঠনে বা আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে নাটকীয়তার স্পর্শ দুর্লভ নয়। বলতে গেলে 'দেশের শত্রু' থেকে শুরু করে 'পনেরোই আগষ্ট' পর্যন্ত স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতা উত্তর উপন্যাসগুলিতে নাটকীয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই নাট্যগুণ সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশ ও প্রতিবেশের সঙ্গে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। রুমালীর প্রণায়াকুতি, কঙ্কণের বিরুদ্ধে কুৎসা, রেশমীর সহমরণ থেকে পালানো, রামরাম বসুর মৃত্যু, জনের প্রেমার্তি, চন্ডীবক্সী ও তিনু চক্রবর্ত্তীর সংঘর্ষ, বনমালাকে উদ্ধার, পরন্তপের সঙ্গে দর্পনারায়ণের অসিযুদ্ধ, পরন্তপের গুপ্তকারাগারে স্বগত সংলাপ প্রভৃতি ঘটনা নাট্যগুণ সম্পন্ন এতে সন্দেহ নেই।

অপরদিকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নাটকীয় শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। নাটকীয়তা রস সৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র অপরাজেয়। নাটকীয় উৎকণ্ঠা, চরমমুহূর্ত সৃষ্টিতে বিশিষ্টতার দাবী রাখে বিভিন্ন উপন্যাস। যেখানে স্নেহ ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, সংঘাত, প্রণয়াকুতি, মানসিক দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে নাট্যগুণে সমৃদ্ধ হয়েছে। এছাড়া প্রচলিত সমাজ নীতির বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের মানস দ্বন্দ্ব তুলে ধরতে গিয়ে এই নাট্যগুণের প্রয়োজন ছিল। কিরণময়ীর বঞ্চিত জীবনের হাহাকার, মহিম ও সুরেশের আকর্ষণে অচলার মানসিক দ্বন্দ্ব, ষোড়শী জীবানন্দের মিলন ঘটনা , পার্বতী ও দেবদাসের সম্পর্কগত জটিলতা, সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত সব্যসাচীর উক্তি — " কল্যাণ আমার কাম্য নয়,আমার কাম্য স্বাধীনতা ' ইত্যাদি বিষয়ও সংলাপগুণে শরৎচন্দ্র সর্বকালের মানুষের হৃদয়রঞ্জন করতে পেরেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসগুলিতে প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর প্রকৃতি বর্ণনায় চরিত্রের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে। 'পদ্মা' ও 'কোপবতী' উপন্যাসে প্রকৃতিরই লীলাক্ষেত্র। কখনও সাদৃশ্য বিধানে, উপমা প্রয়োগে, কখনও পটভূমি নির্মাণে কখনও প্রতীকরূপে প্রমথনাথের প্রকৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী উপন্যাসগুলি যেমন 'কেরী সাহেবের মুন্সী' থেকে 'পনেরোই আগষ্ট' পর্যন্ত উপন্যাসে প্রকৃতির ব্যবহার কমে এসেছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কোথাও কোথাও প্রকৃতির খন্ড সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে ঠিকই কিন্তু এখানে কোনো কবিত্বের উচ্ছ্বাস নেই। বাস্তব সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে গিয়ে শরৎচন্দ্র পটভূমি হিসাবে প্রকৃতির বর্ণনায় অতিরঞ্জন কিছু নেই — প্রকৃতিকে যেভাবে দেখেছেন তাকেই সাদামাঠা ভাবে তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্রের কাছে প্রকৃতি কোনো আবেগের লীলাক্ষেত্র নয় কিংবা কোনো সুসংবদ্ধ প্রকৃতিচেতনার প্রকাশ নেই।

তবে তাঁর অসাধারণ শিল্পদৃষ্টি বিশ্বপ্রকৃতির মহিমা প্রকাশে ছিল সদাব্যস্ত।

এবারে প্রমথনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে। দুজনেই উপমা প্রয়োগে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। কিন্তু সহজ সরল অনলঙ্কৃত ভাষাগুণে শরৎচন্দ্র বাঙ্গালী হৃদয়ে স্থায়ী আসন অধিকার করতে পেরেছেন। তবে প্রমথনাথ ও শরৎচন্দ্র দুজনেই মাঝেমাঝেবিভিন্ন আবেগমন্ডিত যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে সহৃদয় পাঠকের প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন। দুজনের সংলাপে রয়েছে নাটকীয়তা, দুজনেই অনেকক্ষেত্রে নাটকীয় কাহিনী দিয়ে উপন্যাসের শুরু করেছেন। "জিভ কেটে" এই শব্দদ্বয় শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বহুল প্রয়োগ ঘটেছে। প্রমথনাথের উপন্যাসেও এই শব্দদ্বয়ের ব্যাপক ব্যবহার আছে, মনে হয় এ ব্যাপারে প্রমথনাথ শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা, তাঁর অপরিসীম দরদ, সমাজবাস্তবতা ও শিল্পগুণে বঙ্গসাহিত্যের একক ও অনন্য শিল্পী - শরৎসাহিত্য তাই সত্য, শিব ও সুন্দরের ত্রিবেণী সঙ্গম। প্রমথনাথ শরৎচন্দ্রের কাছে ঋণী, শুধু প্রমথনাথই নয় কল্লোলযুগের শিল্পীদের কাছে শরৎচন্দ্রের প্রভাবকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। সমাজ প্রগতিতে, অর্থনৈতিক জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে শরৎচন্দ্রের প্রভাব ছিল 'সুদূরপ্রসারী — শরৎচন্দ্রের প্রেরণাই জীবনধারাকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে।

সমকালীন কথাশিল্পী হিসেবে তারাশঙ্কর ও প্রমথনাথের তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রমথনাথ বিশী ও তারাশঙ্কর কল্লোল সমকালীন লেখক, তাঁদের আবির্ভাব

ব্যাপকতর অর্থে 'কল্লোল' এ হলেও শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। প্রমথনাথ উত্তরবাংলার রূপকার রূপে, তারাশঙ্কর রাঢ় সংস্কৃতির রূপকার রূপে স্বাতন্ত্র্যতার দাবী রাখেন। শহরকেন্দ্রিক 'কল্লোল' থেকে নানাকারণেই এই দুই প্রতিভাধর লেখক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। উভয় লেখকের শিল্পগত বৈপরীত্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

আভিজাত্য ও মানসিতার দিক থেকে দুজনেই সমধর্মী। বংশগত সূত্রে তারাশঙ্কর যুক্ত ছিলেন জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে, রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত বীরভূমের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান হয়ে তারাশঙ্কর দেখেছেন সামন্ততন্ত্র তার আভিজাত্য, শৌর্য হারিয়ে সর্বশেষ তেলটুকু নিয়ে জ্বলে থাকা প্রদীপ শিখাটি ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে সেখানে নতুন করে আলো জ্বলবার সম্ভাবনা দূর অস্ত। এমনকি একটি যুগের ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে তিনি শুনেছেন সামন্ততন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সামন্ততন্ত্রের করুণ ক্রন্দন তাদের অন্তিম হাহাকারে বঙ্গদেশ বিধ্বস্ত। তারাশঙ্কর জানাতে দ্বিধা করেননি তার মনোগত বাসনা ঃ-

" যা অনিবার্য তাঁকে মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই। আমিও পরিবর্তন চাই। নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হলে পুরনোকে বিদায় দিতেই হবে — একথাও মানি কিন্তু যা যায়, তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলবো না, হাহাকার করবোনা — তাই বা কেমন করে হয় ? " [৫]

প্রমথনাথও উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পুত্র - জমিদারী রক্ত ও আভিজাত্য ছিল তাঁর মজ্জায়। দুজনেই বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের জন্য বেদনা মথিত। দুজনেই কালের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ও দুজনেই ঐতিহ্যানুসারী।

তারাশঙ্কর রাঢ়বঙ্গের সৃষ্টি, রাঢ়বঙ্গের জীবনধারার , বিবর্তনের দ্রষ্টা ও ভাষ্যকার।

মানুষের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ এজন্যই তাঁর উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানবত্বের জয়গানে মুখর। তাঁর মাটি ও মানুষ নিঃসন্দেহে রাঢ় বাংলার — এখানকার ব্রাত্যজীবনের কথাকাররূপেই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। রাঢ়বঙ্গের পুরনো নতুন মাটির গন্ধ, তৃণ, বাতাস, নদী ও মানুষকে উপেক্ষা করে যখনই তিনি আরও প্রসারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন সেখানেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন কলকাতা কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলো তার উজ্জ্বল প্রমাণ। তাঁর প্রখর বুদ্ধি, শিল্পজ্ঞান, জীবনদর্শন দিয়ে তিনি যা দেখেছেন আপন অভিজ্ঞতার আলোকে তাই তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন অকপটে। রাঢ়বঙ্গের কাঁটা ও ফুল, অমৃত এবং গরল সবটুকু দিয়ে তারাশঙ্কর নীলসরস্বতীর নৈবেদ্য সাজিয়েছেন এজন্যই তিনি বাংলা সাহিত্যের চতুর্থ সম্রাট রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের পরেই তাঁর স্থান।

বস্তুত তারাশঙ্কর ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী। অপরদিকে প্রমথনাথ বঙ্কিম অনুসারী বিশেষত আঙ্গিকের. দিক থেকে এবং কাব্যধর্মিতার দিক থেকে রবীন্দ্রানুসারী।

প্রমথনাথের জন্মভূমি রাজসাহী জেলা। তাঁর জন্মভূমি পাবনা ও দিনাজপুর জেলার জনপদ জীবনের কথাকার হলেও রাঢ়বঙ্গের বোলপুর, শান্তিনিকেতন, কলকাতা

ভৌগোলিক পটভূমি। তাঁর শিল্পসাফল্য উত্তরবঙ্গকে অতিক্রম করেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমির সিংহভাগ রাঢ়বঙ্গ। 'কবি' উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি রাঢ়দেশের অট্টহাস গ্রাম, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বাঁশবাদি গ্রাম,

'আরোগ্য নিকেতন'এর রাঢ়দেশের দেবীপুর, 'মন্বন্তরে'র পটভূমি কলকাতা। এখানকার একপ্রান্তে শাল , পলাশ, কৃষ্ণচূড়া ও তাল গাছের সারি, মাঝে মাঝে ঢেউএর পরে ঢেউ খেলে যায় শস্যভরা ক্ষেত , কোথাও অনুর্বর কঙ্করময় মাটি, স্থানে স্থানে দীঘি। এখানকার নদী কোপাই, ময়ূরাক্ষী, ভাগীরথী, বক্রেশ্বর, অজয়, কালিন্দী। তারাশঙ্করের সাহিত্যের সংসার গড়ে উঠেছে বহুবিচিত্র চরিত্রের মিছিলে। রাঢ় অঞ্চলের সাওঁতাল, বাউরী, বেদে, ডোম, বোষ্টম, কাহার, মুচি, বীরবংশী, সাপুড়ে, স্বল্পবিত্ত মজুর, সন্ন্যাসী, শ্রমিক, তান্ত্রিক, সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার, কুচক্রী নায়েব, হাতুড়ে চিকিৎসক, শিক্ষক, প্রগতিশীল যুবক, ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত, নটশিল্পী, কয়েদী, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, দারোগা, হাকিম, পুরোহিত প্রভৃতি ম ধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী বিচিত্র মানুষের মিছিলে তাঁর উপন্যাস সমৃদ্ধ। শ্রেণীচরিত্র হিসেবে প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্থান পেয়েছে।

প্রমথনাথ বিশী প্রাক্‌স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পর্বে ষাট বছর ব্যাপী আঠারো খানা উপন্যাস লিখেছেন। তন্মধ্যে দুটি সামাজিক উপন্যাস ব্যতীত অন্যান্য উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক। তবে 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসটি মহাকাব্যিক, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও দুর্লভ নয়। একমাত্র 'পূর্ণাবতার' উপন্যাসটিতে মহাভারতের মৌষলপর্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে আদর্শঘাতী মানুষের পাপবোধ, শাস্তি স্বীকারোক্তি ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি যন্ত্রণাশুদ্ধ উপলব্ধি সার্বজনীন রূপলাভ করেছে আলোচ্য উপন্যাসটিতে।

তারাশঙ্কর ত্রিশ বৎসরব্যাপী বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় উপন্যাস লিখেছেন। তিনটি পর্বে তাঁর উপন্যাসের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে লেখা হয়েছে। 'চৈতালী ঘূর্ণী', 'পাষাণ পুরী', 'নীলকণ্ঠ', 'রাইকমল' ও 'আগুন' প্রথম

পর্বের উপন্যাস। দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল ১৯৩৯ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এসময় তারাশঙ্কর লিখেছেন 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'কালিন্দী', 'কবি', 'পঞ্চগ্রাম', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'। তৃতীয় পর্বের উপন্যাস ১৯৫০ থেকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যপ্ত লেখা — 'আরোগ্য নিকেতন', 'বিচারক', 'রাধা','সপ্তপদী','জবানবন্দী', 'যোগভ্রষ্ট', 'বিপাশা', 'ভুবনপুরের হাট' ও 'গন্নাবেগম' প্রভৃতি।

প্রমথনাথের উপন্যাসের চেয়ে আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে তারাশঙ্করের উপন্যাস। তারাশঙ্করের আঞ্চলিকধর্মী উপন্যাস - 'কবি' 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' এবং 'নাগিনী কন্যার কাহিনী। রাজনৈতিক উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী', 'ধাত্রীদেবতা' ও 'মন্বন্তর'। ঐতিহাসিক উপন্যাস ' গন্না বেগম', 'রাধা'উত্তরায়ণ ও জবানবন্দী। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'কালান্তর' সামাজিক উপন্যাস - 'কালিন্দী', 'আরোগ্য নিকেতন', 'সপ্তপদী', 'যোগভ্রষ্ট', 'বিচারক' 'মহেশ্বেতা', 'মঞ্জুরী অপেরা', 'ভুবনপুরের হাট', 'বিপাশা', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ' , 'রাইকমল'। মহাকাব্যিক উপন্যাস - 'শতাব্দীর মৃত্যু', 'কীর্তিহাটের কড়চা'।

প্রমথনাথের উপন্যাসের বিষয় অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, প্রেম ও প্রকৃতি, অতীত ঐতিহ্যবাহী বিলীয়মান জমিদারতন্ত্রের হাহাকার, দিল্লীর সর্বশেষ মোঘল বাদশার পরাজয়, অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের কলকাতার সমাজজীবন ও ধর্মবোধের পরিচয়।

সংখ্যাগত দিক থেকে ও বৈচিত্র্যগত দিকে থেকে তারাশঙ্করের উপন্যাস স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। তারাশঙ্করের উপন্যাসের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলেই স্বাতন্ত্র্য ও যোগসূত্র

খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

তারাশঙ্করের 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের বিষয় শ্রীমন্তকে ঘিরে রাঢ়ের কৃষিভিত্তিক সমাজের অবক্ষয় চিত্রিত হয়েছে। 'রাইকমল' উপন্যাসে নায়ক রঞ্জন ও কমলের প্রেম বৈষ্ণবীর ভাবধারায় বিকশিত হয়েছে, 'পাষাণপুরী'তে অপরাধবোধ, 'আগুন' উপন্যাসে জটিল জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে অরণ্য প্রকৃতি ও যন্ত্র সভ্যতার অভিঘাত বর্ণিত হয়েছে। 'ধাত্রীদেবতা'য় বিলীয়মান জমিদার জীবনের চিত্র, 'কালিন্দী'তে জমিদারী দম্ভ, জ্ঞাতিবিরোধ ও প্রজাবিরোধের চিত্র, এখানে জমিদারী ষড়যন্ত্র ও অত্যাচার মূল বিষয়। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে' রাঢ়ের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনের ধর্মবোধ অর্থনীতি, সমাজবিন্যাস আঞ্চলিক পালাপার্বনের চিত্র স্থান পেয়েছে। 'মন্বন্তর' উপন্যাসে কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ইংরেজ শক্তির বিরোধের ঘটনা। 'কবি' উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির ধারক হিন্দু সমাজে পতিত ও অবহেলিত ডোম পরিবার ভুক্ত নিতাই তাদের বংশগত দস্যুবৃত্তি ছেড়ে কি করে কবিয়াল হয়েছে সে ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। 'সন্দীপন পাঠশালা'য় সম্মানবঞ্চিত অনাদৃত শিক্ষক সামাজিক প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে তার পরাজয়ের ঘটনা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় কাহার জীবনের পটভূমিকায় নূতন ও পুরনোকালের দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত হয়ে কাহার সমাজের ধ্বংসময় পরিণতি মূল বিষয়। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে সর্প সম্পর্কে লেখকের অভিজ্ঞতার আলোকে বেদেদের ব্যক্তিজীবন ও গোষ্ঠী জীবনের কামনা বাসনা মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। 'উত্তরায়ণে' রূপসম্ভোগ 'বিচারকে' বাঁচার লড়াই, 'সপ্তপদীতে' প্রেমবাসনা, 'জবানবন্দী'তে জমিদারদের ছয় পুরুষের সম্পদ ভোগবাসনা, 'আরোগ্য নিকেতনে' প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক মননশীলতা ও মৃত্যু চেতনার সংঘাত দুই কালের পটভূমিকায় বিন্যস্ত। 'কালান্তরে' গ্রাম থেকে বিতাড়িত গৌরীকান্তের সাহিত্য প্রতিষ্ঠার

পর স্বগ্রামে ফিরে আসার পর গ্রামীণ দুরবস্থা এক তাত্ত্বিকরূপ নিয়ে বর্ণিত হয়েছে। এখানে অন্ধকার থেকে আলোতে, হিংসা থেকে অহিংসায় পৌঁছে এক আনন্দঘন পরিবেশে উপন্যাসের পরিণতিলাভ করেছে। 'মহাশ্বেতা'য় নীরাকে প্রেম নিবেদনের অপরাধে বিনয় সেনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'যোগভ্রষ্টে' সুদর্শনের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা থেকে কিভাবে দন্ডপ্রাপ্ত খুনের আসামীতে পরিণত হল তার কাহিনী বর্ণিত।' ভুবনপুরের হাট ' উপন্যাসে অতীতের হাট থেকে বর্তমানের জনরুচি, মুনাফাসর্বস্ব হয়ে উঠল তার ঘটনা, 'মঞ্জরী অপেরা'য় যাত্রাদলের শিল্পীদের হিংসা, দ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রেম, মান অভিমান প্রকাশিত হয়েছে। 'রাধা' উপন্যাসে ধর্মতত্ত্বের মতবাদ ইতিহাসের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস 'গন্না বেগমে' মোঘল সাম্রাজ্যের অনাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, আমীর ওমরাহদের সুরানারীতে আসক্তির সঙ্গে গজল রচয়িতা গন্না বেগমের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

উপন্যাসের নায়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে তারাশঙ্করের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। প্রমথনাথ ও তারাশঙ্কর ক্ল্যাসিক্যাল যুগের শিল্পীদের মতো নায়ক নির্মিতিতে মহান গৌরবযুক্ত রাজা, রাজপুত কিংবা অভিজাত শ্রেণীভুক্ত নায়ক নির্বাচন করেন নি। দুজনের উপন্যাসের নায়ক সাধারণ শ্রেণীভূক্ত। মূল কাহিনীর নিয়ন্ত্রকরূপে থেকে কাহিনীর পরিণতি পর্যন্ত সাধারণ শ্রেণীভূক্ত নায়কদের অবস্থান।

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের নায়ক সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিনয়, বিমল তার প্রমাণ 'জোড়াদীঘির উদয়াস্তে'র নায়ক যথাক্রমে উদয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, নবীননারায়ণ তারা জমিদার শ্রেণীভূক্ত। নবীনারায়ণ ছ আনির জমিদার। রামরামবসু, জীবনলাল, যজ্ঞেশরায় প্রত্যেকেই সাধারণ শ্রেণীভূক্ত।

পাশাপাশি তারাশঙ্করের উপন্যাসের নায়ক বিচার করে যেতে পারে। পাষাণপুরীর নায়ক জেলের কয়েদী নরু, 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের নায়ক শ্রীমন্ত কৃষক পরিবারের সন্তান, 'রাইকমল' উপন্যাসের নায়ক রঞ্জন, নায়িকা কমল বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারভূক্ত, 'কবি' উপন্যাসের নায়ক ডোম বংশের ছেলে তাদের পূর্বপুরুষ দস্যুবৃত্তি ও বর্বরোচিত জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত, এরূপ অখ্যাত পরিবারের উত্তরপুরুষকেও তারাশঙ্কর নায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছেন। 'ধাত্রী দেবতার' নায়ক জমিদারের ছেলে শিবনাথ, 'কালিন্দী'র নায়ক রামেশ্বর ও কালিন্দীর চর - এখানে মানুষ ও প্রকৃতি দ্বৈত নায়ক। 'গণদেবতা'র নায়ক কামার শ্রেণীভূক্ত অনিরুদ্ধ, 'মন্বন্তরে'র নায়ক - কানাই চক্রবর্ত্তী বিনাশোন্মুখ পরিবারের সন্তান। 'সন্দীপন পাঠশালা'র নায়ক অনাদৃত, অবহেলিত সাধারণ সম্মান থেকে বঞ্চিত শিক্ষক, 'অভিযান' উপন্যাসের নায়ক নরসিংহ, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র নায়ক করালী কাহার কুলের মূর্তিমান প্রতিবাদ, 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'র নায়ক মহাদেব নায়িকা শাবলা, 'আরোগ্য নিকেতন' এর নায়ক জীবনমশাই, নায়িকা পিঙ্গলকেশিনী রহস্যময়ী মৃত্যুদেবী, 'কালান্তরে'র নায়ক সাহিত্যিক গৌরীকান্ত লেখকই পরোক্ষভাবে এই উপন্যাসের নায়ক, 'বিচারক' এর নায়ক জ্ঞানেন্দ্রনাথ 'সপ্তপদী'র নায়ক ও নায়িকা কৃষ্ণেন্দু ও রিনা, 'রাধা'র নায়ক ধর্মপিপাসু মাধবানন্দ, 'উত্তরায়ণে'র নায়ক নায়িকা আরতি ও প্রবীর, 'মহাশ্বেতা'র নায়িকা নীরা, 'যোগভ্রষ্টে'র নায়ক সুদর্শন, 'ভুবনপুরের হাট'এর যথার্থ নায়ক হাট, নায়িকা মালতী, 'মঞ্জরী অপেরা'র নায়িকা যাত্রাদলের শিল্পী, 'গন্না বেগম' এর নায়িকা গজল রচয়িতা গন্না বেগম। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তারাশঙ্করের নায়ক নায়িকারা কেউ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বাউল, কেউ তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসী, কেউ ভৈরব ভৈরবী, কেউ অন্ত্যজ শ্রেণীর, কেউ গ্রামীণ জনজীবনের

প্রতিনিধি, কেউ জমিদার। তারাশঙ্করের ছিল গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে নাড়ীর যোগ । এই চরিত্রগুলির প্রতি তারাশঙ্করের ছিল গভীর সহানুভূতি। নায়ক সৃষ্টিতে তারাশঙ্কর ও প্রমথনাথ সমগোত্রের।

প্রমথনাথ ও তারাশঙ্করের প্রেম চিত্রণের ক্ষেত্রে যে ঐক্য দেখা যায় তা হল - প্রেমের অসফল রূপ চিত্রণে দুজনেই সিদ্ধহস্ত। তবে প্রেমের চিত্র বর্ণনায় দুজনেই দক্ষ শিল্পী। তারাশঙ্করের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় —

" আমি এবং আমার পাঠকেরাও জানেন - প্রেমের গল্প আমার বেশী নেই, প্রেমের গল্পে আমি কিছু আড়ষ্ট। "[৬]

তারাশঙ্করের প্রেম সম্পর্কে দ্বিতীয় উক্তি ঃ-

" আমার সাহিত্যে নব দম্পতি বা প্রেমিকার রাগ বিরহ মিলনের কথা ও চিত্রের অভাব আছে। "[৭]

তারাশঙ্করের সাহিত্যে প্রেমের তিনটি রূপ চিত্রিত হয়েছে -

(১) পরমসত্যাভিমুখী প্রেম অর্থাৎ দেহাতীত প্রেম।

(২) নরনারীর নির্লজ্জ দেহগত প্রেম, যেখানে আদিম যৌনলীলার প্রাধান্য।

(৩) দাম্পত্য প্রেম।

একদিকে বৈষ্ণবীর ভাবধারা, অপরদিকে অন্ত্যজ শ্রেণীর এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রেমের চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। তবে দাম্পত্য প্রেমের মধুর চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে শিল্পকুশলতার পরিচয় ফুটে ওঠে নি।

প্রমথনাথের প্রেমে ফ্রয়েড ও তার উত্তরসূরী হ্যাভলক এলিস এর প্রেমচেতনা দেহভিত্তিক যৌনচেতনার প্রভাব আছে সন্দেহ নেই। আবার ব্যর্থ প্রেমের বর্ণনাও আছে,

দাম্পত্য প্রেমের চিত্রেরও অভাব নেই। কঙ্কণ ও বিনয়ের প্রেমে ফ্রয়েডীয় চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। সীতা র ও নীপেশবাবুর প্রেম, জন ও রেশমীর প্রেম, রুমালী ও জীবনলালের প্রেম চিত্রণে ফ্রয়েডী য় ভাব সুস্পষ্ট। কঙ্কণ ও পারুলকে ঘিরে বিনয়ের ত্রিভুজ প্রেম বিবাহিত জীবনে প্রবেশের সুযোগ পায়নি, ফুল্লরা ও বিমলের প্রাক্‌বিবাহিত প্রেমে ফ্রয়েডীয় প্রভাব থাকলেও দাম্পত্য প্রেম তাদের সুখের হয়নি। বনমালা ও দর্পনারায়ণের দাম্পত্য প্রেম চিত্রিত হলেও দর্পনারায়ণ ইন্দ্রাণীর প্রতি সুপ্ত প্রেমাকাঙক্ষা ভুলতে পারেনি। চাঁপা ও পরন্তপের অবৈধ প্রেম তাদের জীবনে সুখ শান্তি দিতে পারেনি। ইন্দ্রাণী পরন্তপের প্রেমে ছিল প্রতিশোধাকাঙক্ষা চরিতার্থ করবার বাসনা, রেশমী ও জনের প্রেমের সার্থকতা লাভ করেনি। রুমালী, তুলসী ও পান্নার সঙ্গে জীবনলালের প্রেম কোনটি বিবাহিত সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। মলিনার সঙ্গে সুশীলের বিবাহ হয়নি। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রেম অসফল এক করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

অপরদিকে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বনওয়ারী কালোশশী, নিতাই বসন ছাড়া সফল প্রেম নেই। এর মধ্যে বৈধতা অবৈধতা বলে কিছু নেই। অসামাজিক হলেও তারাশঙ্কর দ্বিতীয় বিবাহ 'সাঙা' দেখিয়ে প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। এখানে প্রেম সম্পর্কে দেহটাই বড় করালী ও পাখীর কামনা বাসনা, সুবাসীকে দেখে বনওয়ারীর কালোশশীর প্রতি প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে। ভাঁজো সুন্দরীর পূজোয় কাহার পাড়ায় দিবারাত্র 'অঙের' খেলায় দ্বার থাকে খোলা - যৌন শিথিলতা দেখা যায় সেখানে । নরনারী এখানে আদিম যৌনলীলায় মত্ত থাকে। ধাত্রীদেবতায় ডোমবউ এর মনের মানুষ খুঁজে নেবার উদগ্র কামনা প্রেমের এক বিচিত্ররূপ। 'আগুন' উপন্যাসে চন্দ্রনাথ ও মীরার অসম প্রেম, হীরুর প্রতি যাযাবরী প্রেম ব্যর্থ হয়নি। কালিন্দীর বিমলবাবু, অভিযানের শুখনরাম,

'প্রেম ও প্রয়োজন' উপন্যাসের মহেন্দ্রবাবুর দেহসর্বস্ব প্রেম,শিবনাথ, দেবুঘোষ, সঞ্জীব ও নলিনীর আদর্শ প্রেম বিবাহের স্তরে পৌঁছেছে। 'রাইকমলে' রঞ্জন ও কমলের দেহাতীত প্রেম সার্থকমন্ডিত।

দাম্পত্য প্রেম প্রকাশিত হয়েছে 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসে শ্রীমন্ত ও গিরির দাম্পত্য প্রেমের মধ্য দিয়ে যে প্রেম চিত্রিত হয়েছে তারাশঙ্করের সাফল্য প্রশংসাতীত হতে পারে নি।

কবিয়াল নিতাইচরণের আশাহত প্রেম অনবদ্য সুষমায় মন্ডিত। 'কাশফুল' ও 'কৃষ্ণচূড়া' গাছটি দেখে নিতাই এর আর্তি ভেসে উঠেছে —

" ও আমার মনের মানুষ গো। "

তারাশঙ্করের দেহাতীত প্রেম, যৌনসর্বস্ব প্রেম, দাম্পত্য প্রেমের যে সমাবেশ ঘটেছে তার সঙ্গে প্রমথনাথের প্রেমের যোগসূত্র আছে সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথ ও তারাশঙ্করের নিসর্গচেতনার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রমথনাথের প্রকৃতিচেতনার অনবদ্য নির্দশন 'কোপবতী' ,'পদ্মা', 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' 'চলনবিল' ও 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাস। তাঁর কবিত্বপূর্ণ উপলব্ধি, বর্ণনাত্মক প্রকৃতিপ্রেম শিল্পগুণ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। কখনো উপমার অনুষঙ্গে, কখনো প্রতীকী ব্যঞ্জনায়, কখন চরিত্রগত সঙ্গতি সাধনে কখনও বর্ণনার আনন্দে প্রমথনাথের প্রকৃতিপ্রেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে গাঢ় সংবেদন ফুটে উঠেছে।

'পদ্মা' উপন্যাসে প্রকৃতি প্রতীকরূপে বর্ণনা করেছেন প্রমথনাথ —

" পদ্মার স্রোতের মৃদুরব, দুই একখানা নৌকার দাঁড়ের শব্দ, পাখীদের নীড়ে ফিরিবার ডানার ধ্বনি, দূরের গোধূলির ঘন্টার করুণ কিঙ্কিণী। " [৮]

শীতের অপরাহ্নে পদ্মার রূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিরহবেদনাযুক্ত কঙ্কণের মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে প্রকৃতি মানবচরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিবাহোত্তর জীবনে ফুল্লরা ও বিমলে প্রেমে মান অভিমানের পালা এক তিক্ত অভিজ্ঞতায় উভয়ের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে এমনি একটি মুহূর্তের বর্ণনায় লেখক মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন 'কোপবতী' উপন্যাসে তা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

" আকাশ কী গভীর নীল। আকাশ এত নীল! আর আকাশ কত উপরে। ঐ যে অত উঁচুতে দুটি চিলের কালো বিন্দু - আকাশ আরোও কত উপরে । রৌদ্রেমাজা নিটোল দিগ্বলয় ইন্দ্রাণীর মনিবন্ধচ্যুত সুবর্ণ অঙ্গদ।" [৯]

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসের —

" একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ। প্রকান্ড। প্রাচীন।. . . এই অশ্বত্থ গাছ একাধারে প্রবীন ও নবীন।. . . গ্রামের লোকের চোখে সে আর বৃক্ষ নয় - সে দেবতা " [১০]

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই অশ্বত্থ গাছটি শরিকি দ্বন্দ্বে কাটা হলে গ্রামজীবনে দারুণ অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে। সুপ্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসের উপর আঘাত আসে। আকস্মিক ভূমিকম্পে জোড়াদীঘি গ্রাম বিধ্বস্ত হয়ে আসে।

এই অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র বিল্ববৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কর্তাবাবার অধিষ্ঠানস্থল ছিল এই গাছটি। বাহ্যিক কারণে বেলগাছটি তুলে ফেললে বাঁশবাদি গ্রামে কাহার সমাজের অনিবার্য বিপর্যয় নেমে আসে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রকৃতি এসেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিরূপে ও প্রবীন সংস্কৃতির ধারকরূপে। 'ধাত্রীদেবতা' 'কালিন্দী', 'গণদেবতা'য় প্রকৃতির সঙ্গে

মানবচরিত্রের সুগভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কখন কখন প্রকৃতি রহস্যময় প্রতীকী সত্তায় দেখা দিয়েছে। উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বর্ণনা অনবদ্য —

'দীর্ঘ তালগাছ তপস্বিনীর শীর্ণ বাহুর মত উর্ধ্বলোকে প্রসারিত।'

রাঢ়ের প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে — সাঁওতাল পরগণার হত্যাকান্ডের পরে শিবনাথ ফিরে এসেছে —

" জ্যোৎস্নার পরিপূর্ণতায় আকাশ নক্ষত্রবিরল। উত্তরদিগন্তে ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্তর্ষিমন্ডল পশ্চিমাভিমুখে ঢলিয়া পড়িয়াছে। চড়াই উৎরাই পার হইয়া জনহীন পথ, দুইপাশে ঘন বন। বনের মাথায় জ্যোৎস্না ঘুমাইয়া আছে, তাহারই ছায়ায় পথের উপর আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[১১]

বস্তুগত ভাবে এই সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত করেছেন তারাশঙ্কর।

'কবি' উপন্যাসে তারাশঙ্করের কলমে রাঢ় অঞ্চলের রাসপূর্ণিমার মেলা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে —

" চতুর্দশীর প্রায় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যেও দুই মাইল দূরবর্তী মেলাটার উপরের আকাশখন্ড আলোর আভায় ঝলমল করিতেছে। . . . কেবল আলো - আলো আর আলো, সেই আলোর ছটায় উজ্জ্বল পণ্য সম্ভার ভরা সারি সারি দোকান, আর পথে ঘাটে মাঠে শুধু লোক - লোক আর লোক। মেলাটার স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর — যাত্রা, কবি, পাঁচালি, ঝুমুর। চারিদিকে কাতারে কাতারে দর্শক। "

'কবি' উপন্যাসের প্রেম এসেছে প্রকৃতি প্রেমের পথ বেয়ে। প্রকৃতি এখানে একটা চিন্ময় সত্তার প্রতীক। জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, বসুন্ধরা রূপিণী প্রকৃতি রাঢ়বঙ্গে জননীরূপে শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে মানুষের প্রাণে প্রাণে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে

দেয় । প্রকৃতির প্রতি এই গভীর আর্কষণ থেকেই নিতাইচরণের প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে। নিতাইচরণ বীরবংশীর দুর্ধর্ষ খুনে ডাকাতের বংশে জন্ম। জাতিতে ডোম, ডাকাতের রক্ত তার শিরায় উপশিরায় তার সামাজিক পরিবেশ তার সংসার জীবন সবই আদিমতায় ভরা। সে ভালোবেসেছিল একটি মেয়েকে যার নাম বসন, ঝুমুর দলের মেয়ে সে। পাখী যেমন করে ভালোবাসে ঊষসী ঊষার দ্বার খোলা প্রথম প্রভাতের রক্তিম আলোকে, তপ্ত বালিরাশিযুক্ত উষর ধূসর মরুর বুকে যেমনি করে মরুচারী সুশীতল জলকে স্নিগ্ধ শ্যামল সুন্দর ছায়াবীথিতলকে ভালোবাসে, কিংবা নির্জন দ্বীপের সঙ্গীহীন পুরুষ ভালবাসে অপ্রত্যাশিত কোনো অতিথিকে এ ভালোবাসা তেমনই, এ ভালোবাসা স্বর্ণময় মধুভান্ড ফেলে কমলগন্ধে ভৃঙ্গ যেমন পদ্মফুলে বসে কিংবা পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখাকে ভালোবাসে তেমন ভালোবাসা নয়। এই রূপাতীত প্রেম কবিয়ালকে মাতৃসাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সে সাধনার প্রতীক মৃদুগন্ধযুক্ত যুঁই, শেফালি, বকুল নয় তা রক্তরাঙা জবা মাতৃ পূজার উপযুক্ত ফুল।

'গণদেবতা'র প্রাকৃতিক পরিবেশের বকুলগাছের সঙ্গে প্রমথনাথের অশ্বত্থ গাছের তুলনা করা যেতে পারে —

" হরিজন পল্লীর মজলিসের স্থান - ওই ধর্মরাজঠাকুরের বকুল গাছতলা। বহুদিনের প্রাচীন বকুল গাছটি পত্র পল্লবে পরিধিতে বিশাল। ... ইহা নাকি ধর্মরাজের অসীম মহিমা। "

তারাশঙ্করের প্রকৃতি মূলত রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকৃতি। রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ রক্তিম খোয়াই, রাঙ্গামাটি, বনফুল, শাল্‌পিয়াল, বকুলফুল, বেঁচি আর খৈরি কাঁটার ঝার, বাঁকা তালগাছ, কোপাই , বক্রেশ্বর, ময়ুরাক্ষী , কালিন্দী নদীর ধারে বাউল বোষ্টমীর গান, ডোম, বাউরি, কাহার, সাঁওতাল জীবনের ছবি। অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু

জমিদারতন্ত্র। এই সবুজ বনানীর মধ্যে যখন গৌরী দেখতে পায় —

" আজ জীবনকে যেন স্পষ্ট অনুভব করিল উহাদের জীবন আছে..... এই শস্য সম্ভারের অন্তরালে আছে মাটি।.... সে মাটি ধূলা নয়, কাদা নয়,.... সে মাটির বুকে ফসল ফলিয়া ওঠে যে মাটির বুকে প্রাণ ফাটা দুঃখে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে ভাল লাগে এ মাটি সে মাটি।" [১২] — তখন তা আঞ্চলিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সার্বজনীনতার সুর বেজে ওঠে।

তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র প্রাকৃতিক পরিবেশ কত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি —

" কার্তিক অগ্রহায়ণে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় পলেনের মাঠের রঙ সোনার বরণ। ঝিরঝিরে হিমেল বাতাস, পাকা ধানের গন্ধে ভরপুর করে । গোবিন্দভোগ, বাদশাভোগ, কনকচুর, রামশাল, সিঁদুরমুখী, নয়নকমলা - কত রকমের ধান।... সোনার বরণ ধান ভরা মাঠের বুকে বেড় দিয়ে কাচবরণ জল রূপার হাঁসুলী টলমল - কোপাই নদীর বাঁক।" [১৩]

প্রমথনাথের 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাস ত্রয়ীতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্থানিক পটভূমি, লোকউৎসব, বিশ্বকর্মাপূজা, দুর্গাপূজা, প্রতিমা বিসর্জনের আড়ম্বর ও ঐতিহ্য, নারকেল কাড়াকাড়ি খেলা, মেলা, যাত্রাপালা, দোল উৎসব, লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া, প্রবাদ, কিংবদন্তী, প্রভৃতি আঞ্চলিক জীবনের পরিবাহী।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে রাঢ়বঙ্গের ভূপ্রকৃতি, জনজীবন, ধর্ম, সংস্কার, উৎসব অনুষ্ঠান, দেহতত্ত্বের গান, মা যশোদার বেদনার গান, কবিগান, ঝুমুর নাচ, তরজা, খেউড় প্রভৃতি লোকশিল্প, মেলা, নবান্ন, পৌষপার্বণ, অম্বুবাচী,

রথযাত্রা, ঘেটুপূজা, গাজন, সর্পদেবীর মনসাপূজা, মেয়েলিব্রত, ঘন্টাকর্ণপূজা, ধর্মঠাকুর, ইতুলক্ষ্মী পূজা, পৌষলক্ষ্মীর ব্রতানুষ্ঠান, রাঢ়বঙ্গের অন্ত্যজদের লৌকিক বিশ্বাস, মদ্যাসক্তি, চৌর্যবৃত্তি, অবৈধ যৌন লালসা ইত্যাদির সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে সার্বজনীনতর সুর বেজে উঠেছে।

প্রমথনাথের সঙ্গে তারাশঙ্করের উপন্যাসের গঠনগত তুলনা প্রাসঙ্গিক। প্রমথনাথের উপন্যাস খন্ড ও অধ্যায়ে বিন্যস্ত। উপকাহিনী, প্রকৃতকাল ও আপাতকালের প্রয়োগে বৃত্তের মধ্যে উপবৃত্ত গঠিত হয়ে গঠনরীতি জটিল হয়ে উঠেছে।

এখানে প্রত্যেকটিতেই খন্ড ও অনুচ্ছেদ আছে। উপকাহিনী আছে তাই এর গঠনরীতি জটিল।

পাশাপাশি তারাশঙ্করের কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাসের গঠনরীতি তুলে ধরা হল ঃ

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র ৬ টি পর্ব, পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২৭ টি, পরিচ্ছেদহীন পর্ব ৪,৬ এর উপকাহিনী পাখী - করালী, কালোশশী পরম, সুবাসী করালী।

'আরোগ্য নিকেতন' খন্ড ও পর্বহীন। পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৩৯, পরিচ্ছদহীন পর্ব নেই। উপকাহিনী - প্রদোৎ - মঞ্জু , ভূপতি - মঞ্জরী, অতসী - শশাঙ্ক, পরাণ খাঁ - ছোট বিবি, সাধুবাবা।

'কবি' উপন্যাস খন্ড বা পর্বহীন। পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২১, উপকাহিনী নেই।

এখানে কবি উপন্যাসের গঠনরীতি একরৈখিক। এখানে বহুচরিত্র আছে কিন্তু উপকাহিনী নেই। আরোগ্য নিকেতন খন্ড বা পর্বহীন হলেও সর্বাধিক পরিচ্ছেদ, উপকাহিনী আপাতকাল ও প্রকৃতকালের সমন্বয়ে জটিল গঠনরীতি হয়ে উঠেছে। 'হাঁসুলী বাঁকের

উপকথা'য় চতুর্থ ও ষষ্ঠ পর্বে কোনো পরিচ্ছেদ নেই।

প্রমথনাথ ও তারাশঙ্করের ভাষাগত তুলনা করা যেতে পারে। দুজনেই ভাষা ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তারাশঙ্কর উপভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্রের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা ভদ্রেতর চরিত্রের ভাষারূপে তারাশঙ্কর ব্যবহার করেছেন —

(ক) ধাত্রীদেবতার ডোমবধূর রসিকতা —

" ওঃ জামাইবাবু, গৌরীদিদি যে অ্যানেক চিঠি লিখেছে গো! গান নেখে নাই? একটি গান বলেন কেনে, শুনি।"

(খ) কলহরত চাষীর মুখের ভাষা —

" আমার গদগদে থোরওয়ালা ধান শুকিয়ে মরে যাবে, আর ওর ধান একা শিষ দুলিয়ে পেকে ঢলে পড়বে।"

(গ) " কি রকম মানুষ তুমি গো। তোমার আবার এমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কেনে? আমার দেশের নোক, আমাদের বাবু, বলব না কথা , দেশের খবর নোব না?" (মেসবাড়ির ঝগড়া)

(ঘ) " তার উপর ছিল লগদ লগদ বশ্‌কিশ।"(রাঢ়ের ভাষা)

(ঙ) " কাপড়খানা একেবারে অঙে অঙে অক্ত সনজে্ হয়ে গিয়েছে।"

(রাঢ়ের ভাষা)

পাশাপাশি প্রমথনাথের আঞ্চলিক ভাষা প্রদত্ত হল। তবে প্রমথনাথ তারাশঙ্করের মতো আঞ্চলিক ভাষার ব্যাপক ব্যবহার করেন নি।

(ক) " কে গো বটেক। পোদ্দার মশাই? ও হবেক নি।" (বীরভূমের উপভাষা)

(খ) " ভাবিস নে ছুড়ি তুই রক্ষা পেয়ে গেলি। " (মালদহের আঞ্চলিক ভাষা)

(গ) " তা কেমন করি জানব! অনেক রাত হয়েছে শোও য়্যানে বাবা।"

(পাবনার আঞ্চলিক ভাষা)

প্রমথনাথের উপন্যাসে নারীর মুখের ভাষা, হিন্দীবাংলা মিশ্রিত ভাষা, ইংরেজদের মুখে উচ্চারিত বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন। তারাশঙ্করের উপন্যাসেও হিন্দীবাংলা মিশ্রিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রমথনাথ ও তারাশঙ্করের উপন্যাসে তৎসম শব্দ ও দেশী শব্দের অপূর্ব বিন্যাস ঘটেছে।

প্রমথনাথ ও তারাশঙ্করের উপন্যাসে দীর্ঘ স্বগতোক্তি আছে। দুজনের ভাষায় বৈদগ্ধ্যের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তবে তারাশঙ্করের উপন্যাসকে সরল প্রাঞ্জল ভাষা আছে কোন নাটকীয় চমক সৃষ্টির প্রয়াস নেই। প্রমথনাথ একটু বাঁকিয়ে বাক্যের ব্যবহার করেন।

তবে প্রমথনাথের ভাষায় সাফল্য সংলাপ নৈপুণ্য। তারাশঙ্করের ভাষায় সংলাপ নৈপুণ্যও সার্থক। তারাশঙ্করের ভাষা সমাসবহুল গুরুগম্ভীর কথার মধ্যে কোন মার প্যাঁচ দেখা যায় না। উপমার প্রয়োগ স্বাভাবিক। তবে তারাশঙ্করের ভাষায় রুক্ষতা আছে যদিও এই রুক্ষতা বিষয় বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। প্রমথনাথের ভাষায় রসসৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ, স্থানে স্থানে ব্যঙ্গধর্মী ভাষার ব্যবহারে তিনি দক্ষ শিল্পী।

প্রমথনাথ বিশী ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রমথনাথ বিশী ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একই কাললগ্নে সাহিত্য রচনা করলেও মনের দিক থেকে তাঁরা স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত শিল্পী। দুজনেই 'কল্লোল' এ লিখেছেন কিন্তু প্রমথনাথ কল্লোলের বৈশিষ্ট্যকে তাঁর সাহিত্যে বিশেষ স্থান না দিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কারে বিশ্বাসী হয়েছেন। সমকালকে নিয়ে তাঁর সাহিত্য যেগুলি রচিত হয়েছে তার মধ্যে কল্লোল যুগের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। তবে স্বাধীনতা আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয়বহ। অপরপক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন ঐতিহ্য ও পূর্বসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এখানেই দুজনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। কোলাহল মুখর কল্লোলের অগভীরতাকে সূক্ষ্ম গভীরতায় এনেছেন বলেই অচিন্ত্যকুমার তাকে 'কল্লোলেরই কূলবর্ধন'[১৪] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাকে 'স্বয়ংসিদ্ধ'[১৫] বুদ্ধদেব বসু তাকে 'কল্লোলের বিলম্বিত ফল' ও 'a belated kallolian'[১৬] বলে অভিহিত করেছেন।

প্রমথনাথ ইতিহাস সচেতন, সমাজ সচেতন, বাস্তব সচেতন কথাকার। বাস্তবতার প্রশ্নে 'অতি' কথাটি বোধহয় প্রমথনাথের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পাশাপাশি মানিক বিজ্ঞানসচেতক বিশেষ করে যুক্তি বিজ্ঞানের আলোকে সাধারণ বাস্তব থেকে অতিবাস্তবে যেতে পেরেছেন, তার সমাজচেতনা আরও গভীরতর।

মানসিকতার দিক থেকেও দুজনে স্বতন্ত্র মতবাদে বিশ্বাসী। প্রমথনাথ গান্ধীবাদে বিশ্বাসী এবং মানিক জার্মান দার্শনিক মার্কস এর মতবাদে বিশ্বাসী। মানিক মার্কস এর সাম্যবাদী ভাবধারার পাশাপাশি মনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তার ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বে বিশ্বাসী।

মানুষের অবদমিত কামনা একসময় সুপ্ত থেকে জেগে ওঠে এ শিক্ষা পেয়েছেন ফ্রয়েডের কাছ থেকে। তাই মানিক তাঁর মার্কস পর্বের উপন্যাসগুলোতেও শুধুমাত্র নয় শুরু থেকে সমাপ্তি পর্বের সমস্ত রচনাতেই ফ্রয়েডীয় প্রভাব ছিল ব্যাপক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কার্ল মার্কস ও ফ্রয়েড দুজনে দুই মেরুর অধিবাসী, তবুও মার্কস থেকে ফ্রয়েডীয় ভাবধারায় উত্তরণের কোন পথরেখা তৈরী না থাকলেও মানিক কি করে উভয়ের মধ্যে মেলবন্ধন গড়ে তুললেন, খুঁজে পেলেন জনমানসের সংগ্রামী চেতনা ও আশাবাদের সুর। প্রমথনাথ ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করেন নি তবে তা মানিকের মতো ততোটা আব্রুহীন জীবনের শিথিল সংগ্রামবোধের পরিচয় দেয় নি।

প্রমথনাথের উপন্যাস সম্ভার দুটি পর্ব ও দুটি ধারায় লেখা। প্রাক্‌স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে তিনি লিখেছেন সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি। সামাজিক উপন্যাসগুলোতে প্রেম মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য আর ঐতিহাসিক উপন্যাসে এক দিকে কালের দ্বন্দ্ব অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণিত। এক্ষেত্রে তাঁর শিল্পীমন সুদূর অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ও ঐতিহ্যসচেতক। তাঁর দৃষ্টি কখনো কলকাতায়, কখনো পূর্ববঙ্গের সজল শ্যামল মাটিতে, কখনো দিল্লীর বাদশাহী আমলে আবার মানিকের ঘটনাভূমি পূর্ববঙ্গের পদ্মাবিধৌত স্থান ও কলকাতা।

মানিক পল্লী ও শহরের মধ্যে নিজেকে বিস্তার করে মধ্য বিত্ত ও পল্লীগ্রামের জলে কাদায় মশা মাছিতে পূর্ণ দারিদ্র্য লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষের বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন। সর্বত্র তিনি খুঁজেছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি, মেহনতী মানুষের মধ্যে খুঁজে পেলেন জীবনবোধের পরিচয়। তাঁর বিবর্তনশীল শিল্পীমানস তিন পর্বে বিন্যস্ত। প্রমথপর্বের উপন্যাসগুলি দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্বকালের রচনা যেখানে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের

উপর নির্ভরশীল। 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে ভারতের স্বাধীনতা কালের রচনায় যুদ্ধকালীন মহাশ্মশান ভূমিতে ও স্বাধীনতার রক্তাক্ত ভূমিতে বসে লিখলেন 'শহরতলী প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব', 'অহিংসা', 'প্রতিবিম্ব', 'দর্পণ', 'চিহ্ন', 'চিন্তামণি' ও 'আদায়ের ইতিহাস' যা তাঁর মার্কসবাদী চিন্তাধারার ফসল। তৃতীয় পর্বের উপন্যাসগুলোতে মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটেছে যা তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি — 'চতুষ্কোণ', 'জীয়ন্ত', 'সোনার চেয়ে দামী', 'হরফ', 'হলুদ নদী সবুজ বন', 'পাশাপাশি', 'আরোগ্য' প্রভৃতি উপন্যাসে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি সামাজিক অপরটি রাজনৈতিক উপন্যাস তবে 'পদ্মা নদীর মাঝি' একটি শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। মানিকের রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি 'অহিংসা', 'শহরতলী', 'পাশাপাশি', 'প্রতিবিম্ব', 'চিহ্ন', 'জীয়ন্ত', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'হরফ', উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। 'অহিংসা'য় গান্ধীবাদী আদর্শ ও সন্ত্রাসবাদের চিত্র, 'শহরতলী'তে শ্রমিক ও মিল মালিকের বিরোধ, 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসে কম্যুনিষ্ট পার্টির সমালোচনা, 'চিহ্ন' উপন্যাসে ১৯৪৬ এ রসিক আলি দিবসের পটভূমিকায় লেখা বাংলাভাষা আন্দোলন এখানকার মুখ্য উপজীব্য, 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাসে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমালোচনার মধ্য দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের পথ নির্দেশ দিয়েছেন। 'হরফ' উপন্যাসে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস মূল উপজীব্য। তবে ফ্রয়েডীয় ভাবনা এখানে সমভাবে উচ্চারিত। এই ভাবনা 'দিবারাত্রির কাব্যে' সূচনা হয়ে 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় উত্তরণ ঘটে পরিণতি লাভ করেছে 'চতুষ্কোণ'

উপন্যাসে। 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে হেরম্ব সুপ্রিয়া, অনাথ মালতী রক্তমাংসের গড়া চরিত্র তাদের দুঃখ দারিদ্র ও বঞ্চনা নিয়ে এর কাহিনী। 'পুতুল নাচের ইতিকথা' পল্লীজীবনের মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনী। এখানকার নায়ক নায়িকারা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ষড়যন্ত্রের শিকার। লেখক নরনারীর জৈবিক প্রবৃত্তির গোপন পরিচয় দিয়েছেন। কুসুমের দুর্বার ভালোবাসার প্রতি উদাসীন শশী যেদিন কুসুমকে ভালোবাসা জানায় তখন কুসুম ঝরে যায়, মতির প্রতি কুসুমের পূর্বরাগ বিবাহ যা দাম্পত্য জীবনের একটা পরীক্ষামূলক, এছাড়া গোপালের অপরাধী পিতৃহৃদয়, কুমুদের বোহেমিয়ান জীবন বিন্দুর দাম্পত্যজীবনের অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি বাস্তবতার সঙ্গে ভাববাদের সমন্বয়ে উপন্যাসখানি অপূর্ব যা মানিকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। 'পদ্মা নদীর মাঝি' সর্বাধিক জনপ্রিয় আঞ্চলিক উপন্যাস যেখানে রোমান্টিকতার পথ বেয়ে সর্বহারা ধীবর পল্লীর জীবনচিত্র রূপায়িত হয়েছে। মাঝিদের সংগ্রাম, প্রীতি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সমবেদনা, ষড়যন্ত্র, দলাদলি মানুষের সূক্ষ্ম সংঘাত নিয়ে উপন্যাসের কায়া নির্মিত। পদ্মাপারের কেতুপুর, সোনাখালি, চরডাঙ্গা, দেবীগঞ্জ, আমিন বাড়ি, আকুরটাকুর, চাঁদপুর ও ময়নাদ্বীপ এর ভৌগোলিক পটভূমি। কুবেরের নিষিদ্ধ প্রেমের যন্ত্রণা, কপিলার প্রবৃত্তি তাড়িত মানসিকতা, হোসেন মিঞার লোভ ও ষড়যন্ত্র তার ধর্মনিরপেক্ষ সাম্যবাদী রাষ্ট্রে প্রতীকরূপ ময়নাদ্বীপের প্রতিষ্ঠার আড়ালে অবৈধ কাজের উৎসাহ ও নিয়তির প্রতিরূপ হিসেবে তার ভূমিকা সব মিলিয়ে উপন্যাসটি মানিকের এক অপূর্বসৃষ্টি। 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটি শহরের পটভূমিকায় রিনী, মালতী ও সরসীকে ঘিরে রাজকুমারের যৌনানুভূতি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে চেতনা প্রবাহ ও মনোবিকলনের চরমস্তরে উঠে গেছে।

প্রমথনাথ আঙ্গিক সচেতন শিল্পী। তাঁর একাধিক উপন্যাস নতুন টেকনিকে লেখা।

'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'লালকেল্লা', 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত', 'পদ্মা', উপন্যাসগুলিতে পর্ব ও খন্ডে ভাগ করে নিয়ে অধ্যায়গুলি বিন্যস্ত করেছেন। আবার 'দেশের শত্রু', 'বঙ্গ ভঙ্গ', 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে কোন পর্ব ভাগ করেন নি বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়ে নিয়েছেন। 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসটি সত্তরটি অধ্যায়ে, 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসটি উনচল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'কোপবতী' উপন্যাসটি দুটি খন্ডে ভাগ করে প্রথম খন্ডে তেইশটি অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় খন্ডে সতেরটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন সর্বশেষে পরিশিষ্ট বলে আর একটি অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন। 'লালকেল্লা' উপন্যাসের ভাগ, খন্ড ও অনুচ্ছেদ তিনটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে তিনটি খন্ড - প্রথম খন্ডে সতেরোটি অধ্যায়ে , দ্বিতীয় খন্ডে পনেরোটি অধ্যায়ে, তৃতীয় খন্ডে ষোলটি অধ্যায়ে, দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খন্ডে উনিশটি অধ্যায়, দ্বিতীয় খন্ডে ষোলটি অধ্যায়, তৃতীয় খন্ডে বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত, তৃতীয় ভাগের প্রথম খন্ডে বারোটি অধ্যায় দ্বিতীয় খন্ডের অধ্যায় সংখ্যা চারটি। মোট ৯৪টি অধ্যায় নিয়ে গঠিত 'লালকেল্লা' উপন্যাস। প্রমথনাথের উপন্যাসে উপকাহিনী আছে লালকেল্লায় স্বরূপরাম নয়নচাঁদ ও সুখানন্দ, সুখানন্দ তুলসী ভূতিবুড়ি, প্রভৃতি এর উপকাহিনী। আঙ্গিকে নাট্যগুণ ও ফ্ল্যাশ ব্যাক রীতিতে ইতিহাস বর্ণন ঘটেছে, প্লট হয়েছে জটিল আপাত ও প্রকৃতকালের মধ্যে ঐক্য রক্ষিত হয়েছে।

মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের গঠনরীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় পাঁচটি উপকাহিনী পঞ্চ দম্পতির পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তারা হল মতি - কুমুদ, যাদব - পাগলাদিদি, জয়া বনবিহারী, বিন্দু নন্দলাল ও যামিনী - সেনদিদি। উপন্যাসটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা তেরটি। পদ্মানদীর মাঝির গঠনরীতি হল এর পরিচ্ছেদ সংখ্যা হল সাতটি। দ্বিতীয়

ও সপ্তম পরিচ্ছেদটি অন্যান্য পরিচ্ছেদের চেয়ে দীর্ঘ। কপিলা, গোপী - রাসু, আমিনুদ্দি - নছিবরকে নিয়ে উপকাহিনী গড়ে উঠছে। 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসের গঠনরীতি পরিচ্ছেদহীন টানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বলে প্রবহমানরীতি বেছে নিয়েছেন মানিক। চারটি নারীকে কেন্দ্র করে নায়ক রাজকুমারের বিকারগ্রস্ত মনোভাবের ধারাবাহিক বর্ণনা করতে গিয়ে মানিক প্রবহমান রীতির অনুসরণ করেছেন। লেখক ইচ্ছা করলে চার নায়িকাকে কেন্দ্র করে চারটি উপন্যাস রচনা করতে পারতেন। প্রতিটি উপন্যাসেই মানিক জটজটিল কাহিনী নির্বাচন করেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোও জটিল চরিত্র তবে কমিকচরিত্রগুলিও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।

ঔপন্যাসিক প্রমথনাথ প্রেম চিত্র অঙ্কনে দক্ষ শিল্পী হলেও তাঁর সৃষ্ট প্রেম কখনো সফলতায় রূপান্তরিত হয় নি। একমাত্র ফুল্লরার প্রেম বিবাহের স্তর পর্যন্ত পৌঁছালেও কোপাই নদীতে নায়ক বিমলের সলিল সমাধি নিঃসন্দেহে বিয়োগান্তক পরিণতি বহন করেছে। 'লালকেল্লা'র বাদশা বাহাদুর শাহ ও বেগম জিনৎমহলের দাম্পত্য প্রেম অনবদ্য হলেও রামরাম, জন ও রেশমীর প্রেম, কঙ্কণ, পারুল ও বিনয়ের প্রেম, পান্না, রুমালী ও তুলসীর প্রেম, সুশীল ও মলিনার প্রেম সফল প্রেম হয়ে ওঠে নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমচিত্রণের সঙ্গে প্রমথনাথের প্রেমের পরিণতির ক্ষেত্রে অনেকক্ষেত্রে ঐক্য আছে। পুতুল নাচের ইতিকথায় যাদব পাগলাদিদি ও মতি কুমুদের প্রেম পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করতে পেরেছে। তাদের দাম্পত্য জীবন সংসার গড়ার মধ্য দিয়েই পরিণতি লাভ করেছে। স্নাত মতিকে দেখে শশীর মনে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, কুমুদ মতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। জয়া বনবিহারীর কথা ভেবে শশী কুসুমকে উপেক্ষা করবার জন্য নৈরাশ্য বেদনায় জর্জরিত হয়। 'জীবনের জটিলতা' উপন্যাসে প্রেমের জটিলতায় মুখর। শান্তা স্বামী

অধরের প্রেমকে উপেক্ষা করে বিমলকে ভালবেসেছে পরিণামে অধরের নির্দেশে ছাঁদ থেকে লাফিয়ে মারা যায়। বিমল তার রক্তরঞ্জিত ব্যান্ডেজ মাথায় রেখে শান্তির পথ খুঁজে পেতে চায়। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কপিলা তার সুখের জীবন ছেড়ে কুবেরের জন্য উদগ্রীব হতে দেখা যায়। 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসে প্রেমের সঙ্গে দেহ মনের সম্পর্ক কতটুকু তা দেখানো হয়েছে। নায়ক রাজকুমার এখানে দেহচেতনাকে প্রাধান্য না দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেছেন।

প্রমথনাথের প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসগুলোতে নিসর্গচেতনার বর্ণনায় চরিত্রের সঙ্গে অন্বিষ্ট হয়েছে। কথা সাহিত্যে নদীর একটা স্থান আছে। প্রমথনাথের পদ্মাবিধৌত অঞ্চল , কোপাই এর তীর, যমুনা বিশেষ তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। পটভূমিরূপে প্রমথনাথ ও মানিকের উপন্যাসে প্রকৃতি চেতনা এসেছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথের প্রকৃতিচেতনার গুণগ্রাহী। 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসে পদ্মা প্রকৃতি কিভাবে দর্পনারায়ণ ও বনমালার নদীবক্ষে বজরায় যে অনিশ্চিত জীবন প্রবাহিত হয়েছিল প্রমথনাথ তার অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন —

"সে বজরার ছাদের উপর আসিয়া বসিল। শীতের কুয়াশা তখনও নদীর উপরে ও দুই তীরের মাঠের উপরে অতি সূক্ষ্ম মলমলের থানের মত বিলম্বিত; নদীর জল কুয়াশায় আচ্ছন্ন, কলধ্বনিই তার অস্তিত্বের যেন প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুই পাশের তীরে কুয়াশায় মলমল বিদীর্ণ করিবার জন্য সূর্যের ভূমিশায়ী রশ্মিরেখা চেষ্টা করিতেছে ; আশেপাশের গাছপালায় অস্পষ্ট আকার আলো ভীরু প্রেতাত্মার মত শঙ্কিতভাবে কাঁপিতেছে।" [১৭]

'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসের একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি — ভুমিকম্পে জোড়াদীঘির দশ আনির জমিদারবাড়ী বিধ্বস্ত প্রমথনাথ তার বর্ণনা দিয়েছেন —

" শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশাজমা নিশ্বাসরোধী অন্ধকার অট্টালিকার বিদীর্ণ শিখরে বসিয়া হুতুমপেঁচা গম্ভীর আওয়াজের হাতুড়ি ঠুকিতে থাকে - কালপেঁচা অতীত অভিজ্ঞতার সমর্থনে ডাকিয়া ডাকিয়া মরে। অসংখ্য স্মৃতির স্রোত নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। মানুষের জগতের সীমান্তে এই মানবহীন পুরী। "

প্রকৃতি এখানে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি চিত্রণে বিজ্ঞানমনস্কতা যুক্ত হয়েছে এজন্যই তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে প্রমথনাথের প্রকৃতিচেতনার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মানিকের প্রকৃতিচিত্রণ শুধুমাত্র বর্ণ গন্ধ ও দৃশ্যের বর্ণনাই হয়ে ওঠে নি তার সঙ্গে চরিত্রের নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কিভাবে তা প্রদত্ত হল ঃ -

" বটগাছের ঘন পাতাতেও বেশীক্ষণ বৃষ্টি আটকাইল না। হারু দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল। স্থানটিতে ওজোনের সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল। অদূরে ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িত লাগিল। সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় ধীরে ধীরে পাক খুলিয়া ঝোপের বাহিরে আসিল। ক্ষণকাল স্থিরভাবে কুটিল অপলক চোখে হারুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহারই দুই পায়ের মধ্য দিয়াই বটগাছের কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল।" [১৮]

— এখানে হারুর মৃত্যু আঘাতের সঙ্গে সাপের অনুষঙ্গ দৃশ্য গন্ধ বর্ণ মিলিয়ে রহস্যময়তা, মৃত্যু ও জীবনের মানে খোঁজার ইচ্ছে শশীকে এক জীবন ভাবনার জগতে এগিয়ে নিয়েছে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি পদ্মাকেন্দ্রিক ধীরব জীবনের আলেখ্য। ঋতু বদলের

সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা কেন্দ্রিক জীবনের ঘটে বিবর্তন। মানিক পদ্মার রূপ বর্ণনার চেয়ে মাঝিদের জীবন বর্ণনাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা উপন্যাসটি প্রমথনাথের 'পদ্মা' নয় 'পদ্মানদীর মাঝি' জীবিকার জন্য মাঝিরা পদ্মাবক্ষে জাল ফেলে। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন —

" বর্ষার মাঝামাঝি। পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়ই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। . . . . লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মত দেখায়। " [১৯]

লেখক এখানে চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র ধরেই পদ্মার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রমথনাথের পদ্মাপ্রকৃতি মানিকের মতো চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষারীতির তুলনামূলক আলোচনা এ প্রসঙ্গে চলে আসে। প্রমথনাথ বিশীর সাহিত্যে ভাষাগত বিস্তৃতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা থেকে শুরু করে তৎসম শব্দবহুল ভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্রের ভাষা প্রয়োগের সুনিপুণ শিল্পী প্রমথনাথ। স্থানে স্থানে ইতিহাস পুরাণের শব্দাবলী প্রয়োগ করেছেন। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারেও তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসাতীত। ইংরেজদের বাংলা উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত তিনি তাঁর যথাযথ ব্যবহার করেছেন । ধ্বন্যাত্মকশব্দ প্রয়োগ, উপমার যথাযথ ব্যবহার করেছেন শিল্পী প্রমথনাথ, তাঁর ভাষায় একদিকেআবেগময়তা ও নাট্যধর্মীতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

উপভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানিক প্রমথনাথের মতো উৎসাহী না হলেও

'পদ্মানদীর মাঝি'তে আঞ্চলিক ভাষা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। যেমন —

" কপিলা বলে, তামুক ফেইল্যা আইছ মাঝি। কুবের নামিয়া আসিয়া তামাকের দলাটি গ্রহণ করে। বলে, খাটাসের মত হাসিস ক্যান কপিলা, আঁই? কপিলা বলে, ডরাইছিলা, হ? আরে পুরুষ।" .... "তারপর বলে, আমাকে নিবা মাঝি লগে।" [২০]

পূর্ববঙ্গের নানা আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে মানিক দক্ষ শিল্পী।

প্রথনাথের 'পদ্মা' উপন্যাসে রাজসাহী জেলার উপভাষা ভাগচাষী করিমের মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন ঃ

" আমি কি কাঁদতে কইছি।

একবার গিয়া দেইখ্যা আইসেন। সে হইব না।" [২১]

মানিকের তৎসম শব্দের ব্যবহার কম। তবে লেখকের কণ্ঠস্বর বেশ আকর্ষণীয় বলে তৎসম শব্দের বিষম ব্যবহারে কোন অসঙ্গতি নেই। পাশাপাশি তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দের মিশ্রণে প্রমথনাথ দক্ষ শিল্পী।

প্রমথনাথ ও মানিকের ভাষায় দীর্ঘ স্বগতোক্তি আছে আবার স্বল্প বাক্যও বর্তমান।

প্রমথনাথ মানিকের মতো বুদ্ধিদীপ্ত শব্দ প্রয়োগ করেছেন যেমন —

" কলকাতার মহাসমুদ্রে হাঙর কুমীর রাঘব বোয়াল থাকতে তোমাকে আমাকে ডাকবে কে ? "[২২] মানিকের শহুরে শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাষায় জটিল মনোভঙ্গী ও কথনভঙ্গী এবং বাংলা বাক্যকে একটু বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রমথনাথ অনেক ক্ষেত্রে তীর্যক ভাষা প্রয়োগ করেছেন।

প্রমথনাথের প্রথম দিককার উপন্যাসগুলোতে বর্ণনা অংশে সাধুভাষা ও সংলাপ অংশে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে পরবর্তী উপন্যাসগুলোতে পুরোপুরি চলিত

ভাষা ব্যবহার করেছেন। মানিকের উপন্যাসে প্রথমদিকে সাধুভাষা ও পরবর্তীকালের উপন্যাসে চলিত ভাষার সুষম ব্যবহার করেছেন। যেমন -

" এ বেলায় অবস্থাটা যে এ রকম দাঁড়াইবে সে তাহা ভাবিতেও পারে নাই। " [২৩]

আবার তৎসম শব্দের ব্যবহার করেছেন যথাযথভাবে। যেমন —

" রহস্যানুভূতির এ প্রক্রিয়া শশীর মৌলিক নয়। "

তার সহজ সাবলীল ভাষা কতটা রসোত্তীর্ণ হয়েছে প্রশ্নবোধক বাক্যে তা ধরা পড়েছে — " স্বামী দেনা করে তাকে আরামে রেখেছে জানলে কোন স্ত্রী খুশি হয় ?" [২৪]

পরিশেষে বলা যায় প্রমথনাথ ও মানিক দুই স্বতন্ত্রধারার লেখক। তাঁদের মধ্যে যোগসূত্রের চেয়ে পার্থক্য বেশী করে দেখা যায়।

প্রমথনাথ বিশী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনামূলক পর্যালোচনা

সর্বকালের বাংলা সাহিত্যের মাইলস্টোন রূপে শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক উল্লেখযোগ্য নাম। প্রমথনাথ ও বিভূতিভূষণ সমকালবর্তী লেখক কিন্তু তাঁরা সমগোত্রের লেখক নন। সাহিত্য শৈলীর দিক থেকে দুই লেখকের মধ্যে যোগসূত্রের চেয়ে বৈপরীত্ত বেশী।

বিভূতিভূষণ পল্লীপ্রকৃতির কথাকার, অরণ্য প্রকৃতির কথাকার। জীবনানন্দ ও কুমুদরঞ্জনের প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে তুলনীয় হলেও বিভূতিভূষণ স্বতন্ত্র ধারার

নিসর্গরূপশিল্পী। বাংলা কথাসাহিত্যে বিভূতিভূষণ ছাড়া হয়তো অন্য কোন কথাশিল্পী প্রকৃতিকে এত বড় করে দেখে নি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ইন্দ্রধনুরূপে পল্লীবাংলা থেকে আহরণ করেছেন তাঁর উপন্যাসের উপাদান - মানুষ ও প্রকৃতির সমগুরুত্ব দিয়েছেন বলে তিনি দ্বৈতবাদী। বস্তুত বাংলা সামাজিক উপন্যাস এতকাল ব্যক্তি ও সমাজ সমস্যাতেই যে কক্ষপথ তৈরী করেছিল বিভূতিভূষণ উপন্যাসের পরিধিকে আরোও বিস্তৃত করলেন। নিসর্গ চেতনায় বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে অনন্য ও একক। প্রমথনাথ রোমান্টিক কবিমন নিয়ে প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসগুলিতে প্রকৃতি চিত্র আঁকলেও ঐতিহাসিক উপাদানই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। অথচ বিভূতিভূষণের লেখনীতে প্রকৃতির কান্ত ও কঠিনরূপ হয়ে উঠেছে মুখ্য উপাদান মানুষ সেখানে গৌণ হয়ে দেখা দিয়েছে ।

প্রমথনাথ ও বিভূতিভূষণ সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। উনিশ শতকের জমিদারী শাসন তাদের বিরোধ অবক্ষয় থেকে শুরু করে ইংরেজ অনুপ্রাণিত বাঙালী জীবনাচরণ, ইংরেজদের বিলাসী জীবন মোঘল সাম্রাজ্যের অনিবার্য পতনোন্মুখ অবস্থা, সুরা ও নারীর প্রতি আসক্তি, মূল্যবোধের অপচয়, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি যুগসন্ধিকালের উদভ্রান্ত অবস্থা বর্ণনায় মুখর। অপরদিকে ভারতীয় রাজনীতির উত্তালকর অবস্থা বর্ণনায় ক্লান্ত। কালগত সচেতনতা, সামাজিক সমস্যা ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনে তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন প্রমথনাথ। পাশাপাশি বিভূতিভূষণের সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে আবহমান কাল ধরে বঙ্গভূমির গ্রামীণ অনিন্দ্যসুন্দর দৃশ্য বনভূমি ও জলস্রোতের স্নিগ্ধ রূপ অতিপরিচিত প্রেক্ষাপট ও জীবনসত্য সেই সঙ্গে আধ্যাত্মবিশ্বাস ও অলৌকিক রহস্যানুভূতিযুক্ত আনন্দের জগৎ উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরে কালোত্তীর্ণ রসসমৃদ্ধ সাহিত্য সম্ভার বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রমথনাথের সাহিত্য যেখানে

ঘটনাবাহুল্য, চারিত্রিক দ্বন্দ্ব, জীবনসংকটের জটিলতা ইত্যাদি বিশ্লেষনাত্মক দিক শিল্পময় হয়ে উঠেছে সেখানে বিভূতিভূষণের সাহিত্যে নেই ঘটনার সংঘাত, নেই তেমনি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নেই কঠিন কোন সমস্যা পল্লীবাংলার জীবনের ছোটছোট দুঃখ কথার সঙ্গে গভীর প্রকৃতি চেতনা, করুণ বিষন্ন নরনারী চরিত্র, শান্ত উদাস সুরতরঙ্গ, স্বপ্নমেদুরতা ও আধ্যাত্মচতনা তাঁর কোমল পরশে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথের চরিত্রগুলো সাধারণ শ্রেণীভূক্ত তবে উদয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ, নবীননারায়ণ, বাদাশা বাহাদুর শাহ, ইন্দ্রাণী, বেগম জিনৎমহল কেহই সাধারণ শ্রেণীভূক্ত নয়। আবার বিমল, বিনয়, রামরাম, জীবনলাল, যজ্ঞেশরায় প্রত্যেকেই সাধারণ স্তরের নায়ক। অপরদিকে বিভূতিভূষণের নায়ক চরিত্র আরও পরিচিত তারা মধ্যবিত্ত নিম্ন তথা নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীভূক্ত। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র নায়ক অপু 'দৃষ্টিপ্রদীপ' এর জিতু , 'আরণ্যক' এর সত্যচরণ, 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র হাজারি ঠাকুর, 'বিপিনের সংসারে'র বিপিন, 'অনুবর্ত্তন'এর শিক্ষক নারায়ণ বাবু, 'দেবযান' উপন্যাসের নায়ক যতীন, 'ইছামতীর' নায়ক নায়িকা গ্রাম্য নরনারী, 'অশনি সংকেতে'র নায়ক গঙ্গাচরণ তারা প্রত্যেকেই সাধারণ স্তরের।

প্রমথনাথের উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি উত্তরবঙ্গের রাজসাহী, পাবনা, দিনাজপুর জেলা, কলকাতা, রাঢ়বঙ্গের বীরভূম ও দিল্লী । বিভূতিভূষণের সাহিত্যে যশোহর, নদীয়া ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার একটি অঞ্চল, নিশ্চিন্দিপুর, বিহারের লবটুলিয়ার বইহার, দার্জিলিং, রানাঘাট, পূর্ববঙ্গের পলাশপুর, বীজপুর, কলিকাতা, হিমালয়, চাকদহ, গৌড়, ইছামতী নদী ও তার তীরবর্ত্তী গ্রাম ভৌগোলিক পটভূমি হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রাকৃতিক পটভূমি রূপে আম জাম বনকুসুমে, পদ্মফুলে ভরা বিল, সবুজ

বনানী, পল্লীর উদার আকাশ, কাশফুল, ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ, ধূধূ মাঠ, শান্ত নদীতীর, ছাতিম বন, আকন্দফুল, বনঝোপ, ঘেটুবন, গাঙশালিকের বাসা, বিস্তৃত জ্যোৎস্না প্রকৃতির অনুষঙ্গরূপে এসেছে।

প্রমথনাথ তাঁর উপন্যাসে সমকালীন যুগযন্ত্রণার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন 'বঙ্গভঙ্গ', 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে স্বাধীনতার প্রাপ্তিকালের রাজনৈতিক ঘটনা এই দুটি উপন্যাসের মূল বিষয়। অপরদিকে বিভূতিভূষণের 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসে সমকালীন যুগের প্রতিফলন ঘটেছে শিক্ষক সমাজের সর্বরিক্ততার মধ্য দিয়ে, 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসের বিপিনের আর্থিক দৈন্যতা, 'দুই বাড়ি' উপন্যাসের বৈষম্য ও সম্পর্ক স্থাপন, 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পরিণতি কতটা বাস্তব বিভূতিভূষণ তা দেখিয়েছেন। চালের বদলে কলাই, মানকচু, গেরিগুগলি খেতে বাধ্য হয়েছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ। উপন্যাসে কি করে ব্রাহ্মণের সম্মানজনক ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে গঙ্গাচরণ চরিত্রের মধ্যস্থতায় লেখক তা দেখিয়েছেন।

আবার যুগযন্ত্রণা থেকে মুক্ত সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রহস্যময়তা ও আধ্যাত্মচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' , 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'দেবযান'ও 'ইছামতী ' উপন্যাসে। তাঁর 'আরণ্যক' ও 'ইছামতী ' উপন্যাসে প্রকৃতি মুখ্য স্থান ও মানুষ গৌণস্থান অধিকার করেছে।

উপন্যাসের একটি মূল বিষয় প্রেম। প্রমথনাথ ও বিভূতিভূষণের প্রেমভাবনার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিনয় কঙ্কণের প্রেম, বিমল ফুল্লরার প্রেম, নীপেশ সীতার প্রেম, জন রেশমীর প্রেম, জীবনলাল রুমালীর প্রেমে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন প্রাধান্য পেয়েছে যা অযুত কামনা জর্জরিত প্রেম সফল প্রেমে রূপান্তরিত হতে পারে নি।

প্রমথনাথের মতো বৈদ্যুতী প্রেম বিভূতিভূষণে নেই তাঁর নায়িকারা স্নেহ সেবা ও কারুণ্য মন্ডিত চিত্তের সহজাত প্রবণতার একান্ত অভাব। 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপু ও লীলার প্রেম দেহাতীত প্রেমের নির্দশন। অপর্ণা ঘুমন্ত অপুর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে —

" এমন একটা মায়া হয় ওর ওপরে " [২৫]

— এই মায়াই বিভূতিভূষণের প্রেম।

'আরণ্যকে' দোবরু পান্না ও ভানুমতির প্রীতি মধুর সম্পর্ক মধুররসের পরিচায়ক। দর্পনারায়ণ ও বনমালার প্রেম এই ধারার অনুবর্ত্তন। 'দৃষ্টিপ্রদীপ'এ জিতু মালতীর প্রেমাসক্তি ও প্রেমাবেগ উচ্চারিত। সমাজ অনুমোদিত প্রেম গড়ে উঠেছে বিপিনের সংসার উপন্যাসে। বিপিন স্ত্রী মনোরমা থাকা সত্বেও মানী ও শান্তি নামে দুই বিবাহিত নারীর অহেতুক আবির্ভাবে বিপিনের জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়েছে অবৈধ প্রেমে রূপান্তরিত হয় নি। 'চলনবিল' উপন্যাসে পরন্তপ ও চাঁপার অবৈধ প্রেম পরন্তপকে ঘরছাড়া করেছে এই উদগ্র প্রেমভাবনা প্রমথনাথের উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। 'দুই বাড়ি' উপন্যাসে গ্রাম্য কিশোর কিশোরীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের কলমে।

প্রমথনাথের 'পূর্ণাবতার' উপন্যাসে আধ্যাত্মচেতনা আছে কিন্তু তা আত্মানুশোচনার পরিণতি। কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ও মানবচেতনার সঙ্গে আধ্যাত্মচেতনার নিবিড় সম্পর্ক। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'দেবযান' উপন্যাসে মিষ্টিকধর্মী আধ্যাত্মচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। বিভূতিভূষণের মধ্যে দার্শনিক কবিমন জাগ্রত হয়েছে বেদ কিংবা উপনিষদ থেকে। প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে রোমান্টিক ও মিষ্টিক চেতনার উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ সমধর্মী। প্রকৃতির অনুধ্যানে বিভূতিভূষণ খুঁজে পেয়েছেন বিশ্বদেবতার রহস্যময়তাকে। 'দেবযান' গ্রন্থের শুরুতে গীতা ও উপনিষদের শ্লোক ও বার্গস এর গতিতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। তাঁর

আধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে চলমান মহাকালের গতিসূত্র খুঁজে পেয়ে 'চরৈবেতি'র বিশ্বাসী হয়েছেন। 'অপরাজিত'র নায়ক অপু, 'দৃষ্টিপ্রদীপ'এর জিতুর মনে এই উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছিল। ডঃ সমরেশ মজুমদার বলেছেন —

"দেবযানে পরলোক কথা স্বর্গলোকের বিভিন্নস্তর, করুণাদেবী প্রমুখের অংশ, প্রেতযোনী কল্প, মানব আবর্তন, সপ্তস্বর, বৈশ্রবণ, নির্গুণ ব্রহ্মলোক বিস্মৃত হয়েও যতীন ও পুষ্পের প্রেমময় জীবনের কাহিনী বাস্তব, সুখদুঃখ ঘেরা কাহিনী হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে।"[২৬]

তাই 'দেবযান' দেবত্ব নয় মানবতার পূজারী বিভূতিভূষণের কলমে মানবপ্রেমের বিজয়পতাকা উড়েছে বলেই মনে হয়।

প্রমথনাথ বিশী ও বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনার তুলনামূলক আলোচনার পরিচয় আরও একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রমথনাথের রাঢ় বঙ্গের নিসর্গচেতনা কতটা কোমল ও রুক্ষকঠিন দ্বৈতরূপে সৌন্দর্যরস সৃষ্টি করেছে তার অনবদ্য নিদর্শন 'কোপবতী' উপন্যাস। প্রমথনাথ বর্ণনা দিয়েছেন —

"কোপাই এর তীরবর্তী বনভূমিতে করবী, কাঞ্চন, পলাশ, শিমূল, গুলমোরের, থোলো, আমের মুকুল, শিরীষফুল, বনজ্যোৎস্না, বনচামেলি . . . . ফুল্লরা আলগোছে বাঁধা খোপা ঘিরিয়া করবী ফুলের বেড়, কানে একটি করিয়া শিরীষ; কণ্ঠে বিনিসূতায় গাঁথা কাঞ্চনের হার - আর কটি ঘিরিয়া কিংশুকের মেখলা; হাতে আমের মুকুলের মঞ্জরী।"[২৭]

— নায়িকা ফুল্লরা বনলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ পেয়ে অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে। ফুল্লরা এখানে বনদেবীর রূপক স্বরূপ। ফুল্লরা ও বিমল এসে বনলক্ষ্মীর কাছে ধরা দিয়েছে।

বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাসে বনদেবীর কাছে অপুর প্রার্থনা —

" অন্য কিছু চাইনে! এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশ বাগানের ছায়ায় অবোধ, উদগ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই দশ বছরের বয়সের শৈশবটি — তাকে একবার ফিরিয়ে দেবে দেবী ? " [২৮]

কিংবা 'আরণ্যকে' সত্যচরণকে রহস্যময়ী বনদেবীর কাছে ধরা দিতে হয়েছিল। বিভূতিভূষণের অভিমানিনী প্রকৃতি অবগুণ্ঠন খুলে দিয়ে তাঁর কাছে এভাবে ধরা দিয়েছে।

প্রমথনাথের 'পদ্মা' উপন্যাসের প্রকৃতির সঙ্গে 'ইছামতী'র প্রকৃতিচেতনার সৌসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে 'ইছামতী'তে প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা মন্ডিত কবিদৃষ্টি একাকার হয়ে গেছে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে শিশু হৃদয় একাকার হলেও এর অন্তরালে আছে তাঁর প্রজ্ঞা দৃষ্টি। এই দৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বচেতনা, চলমান কালের চেতনা ও আধ্যাত্মচেতনার সমন্বয় ঘটেছে। বিশ্বপ্রকৃতিতে শক্তিরূপিণী দেবীর অস্তিত্ব খুঁজে পেয়ে বলেন — " এ বিশ্বের সঙ্গে আমি একতারে গাঁথা" প্রকৃতির নীরব বাণী শুনে তাঁর মধ্যে নিজের রূপ ও মানুষের প্রতিরূপ খুঁজে পান নিসর্গের কোলে এখানেই বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনার বিশেষত্ব।

প্রমথনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের আখ্যায়িকা গঠনের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রমথনাথ ছিলেন আঙ্গিক সচেতন শিল্পী - কাহিনী, চরিত্র, ভাষা, উপস্থাপনরীতি, নাট্যগুণ ও কাব্যগুণ প্রমথনাথের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। আঙ্গিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের আঙ্গিকের পার্থক্য ঘটেছে।

তুলনামূলক ভাবে বিভূতিভূষণ প্রচলিত আঙ্গিকের পথ পরিহার করে অভিনব আঙ্গিকের প্রবর্তক। বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিক শিথিলতা বিভূতিভূষণের শিল্পপ্রকরণের

বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিচিত্রণে কাব্যধর্মিতা বজায় রাখতে গিয়ে বিভূতিভূষণ আঙ্গিকের নিয়মকে অনুসরণ না করলেও 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক' ও 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসে বিষয় ও আঙ্গিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছেন।

সর্বশেষে প্রমথনাথ ও বিভূতিভূষণের ভাষারীতির তুলনা অপরিহার্য। প্রমথনাথের উপন্যাস বিষয়ের উপর নির্ভর করে ভাষার বাঁধুনি গড়ে তুলেছেন। 'পদ্মা', 'কোপবতী', 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'চলববিল', 'অশ্বত্থের অভিশাপ' উপন্যাসে বর্ণনায় - সাধুরীতি ও সংলাপ অংশে চলিত রীতি ব্যবহার করেছেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' থেকে 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে সংলাপ ও বর্ণনা অংশে চলিত ভাষার প্রয়োগ করেছেন। ভাষা ব্যবহারে প্রমথনাথের শিল্পদক্ষতার অভাব ঘটেনি। প্রমথনাথের ভদ্র ও ভদ্রেতর চরিত্রের ভাষা সার্থক ভাবে ব্যবহার করেছেন। 'লালকেল্লা' উপন্যাসে শাহজাদার মুখে যে ভাষা যথোপযুক্ত তাই ব্যবহার করেছেন। যেমন —

" তোবা, তোবা! পিয়ারী, পুরনো জিনিসের স্বাদ কি নূতনে আছে? এই দেখোনা কেন, এই বোতলের সরাপ বাদশা - জাহাঙ্গীরের আমলে চোলাই করা হয়েছিল। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে না হয় একপাত্র খেয়ে দ্যাখো। [২৯]

হিন্দী ভাষার ব্যবহার —

" বাত তো ওহি হ্যায় লেকিন তুলসী দাসজি ভাখামে বোলা হ্যায় - সৎ গুরু পাওয়ে ভেক বাতাওয়ে জান কর উপদেশ।" [৩০]

প্রমথনাথের 'পদ্মা' উপন্যাসে বিভূতিভূষণের মত নিখিল বিশ্বের রহস্যময়তা ফুটে উঠেছেঃ

" কেবল নিরঞ্জন নির্মল শূণ্য বিরাট নীলাম্বরীর নীলতম প্রান্ত। আকাশের উত্তর

কোণে ওই যে রাশি রাশি কার্পাসস্তূপের মত নীহারিকাপুঞ্জ, লক্ষ লক্ষ জোতিষ্কের অবিরাম উদয়াস্তের টানাপোড়েনে ঐ জ্যোতির্ময় আলৌকিক কার্পাস হইতে ঊর্ণাতন্তু সূক্ষ্ম আলোময় সূত্র তুলিয়া, ঐ নীলাম্বরীর ধারে ধারে দু একটি কল্কা তুলিয়া দেয়, ইহাই আমাদের চিরাচরিত গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ।''

তৎসম ও দেশী শব্দের বিন্যাস প্রমথনাথ ও বিভূতিভূষণের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য।

বিভূতিভূষণ চরিত্রগুলির সংলাপ অংশে যশোহর অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দ ও কথ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'ইছামতী' উপন্যাস তার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রমথনাথ মালদহ, পাবনা জেলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

প্রমথনাথ মাঝে মাঝে চরিত্রকে ও পাঠককে সম্বোধন করে কথা বলেছেন। বিভূতিভূষণকে চরিত্রকে সম্বোধন করে কথা বলতে দেখা গিয়েছে।

প্রমথনাথের ভাষার বক্রতা, বৈদগ্ধতা আছে কিন্তু বিভূতিভূষণের ভাষায় কাব্যধর্মী লক্ষণ ফুটে উঠেছে 'পথের পাঁচালী' থেকে 'অশনি সঙ্কেত' পর্যন্ত সমস্ত উপন্যাসে।

প্রমথনাথের উর্দুঘেঁষা ভোজপুরী হিন্দী ভাষার দৃষ্টান্ত পূর্বে দেওয়া হয়েছে। বিভূতিভূষণ গয়া ও ভাগলপুরের স্থানীয় হিন্দী ভাষার ব্যবহার করেছেন যেমন —

'' হো গৈল হজরকী কৃপাসে কড়াইয়া হো গৈল।'' [৩১]

বিভূতিভূষণের মিশ্র ভাষার প্রয়োগ —

'' ওখানে হাওয়া গাড়ি দেখেছি তাজ্জব চিজ হুজুর।''[৩২]

'পথের পাঁচালি'তে জীবনবোধ ও প্রকৃতিসত্তার সম্মিলিত রূপের বর্ণনামূলক ভাষা

'' দিনের রাত্রি পার হয়ে, জন্মমরণ পার হয়ে, মাস বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে

চলে যায় .... তোমাদের মর্ম্মর জীবনস্বপ্ন শেওলা ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না ... চলে ... চলে ... চলে ... এগিয়ে চলে।" [৩৩]

উপসংহার পর্বে বলা যায় আখ্যান গঠন, চরিত্র, প্রেম, পটভূমি, আধ্যাত্মিকতা, ভাষা ও জীবনদর্শন সব মিলিয়ে দুজন কথাশিল্পীর মধ্যে যোগসূত্র স্থানে স্থানে থাকলেও বৈপরীত্যই বেশী বলে মনে হয়।

প্রমথনাথ বিশী ও জগদীশ গুপ্ত
তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রমথনাথ বিশী ও জগদীশ গুপ্তের জন্ম সময়ের ব্যবধান ১৬ বছর। সমসাময়িক কল্লোলের তরুণ সাহিত্যিকদের চেয়ে বয়সে প্রবীন হলেও জগদীশ গুপ্ত মানসিকতায় কল্লোল পত্রিকার তারুণ্যের ভাবভাবনা, মত পথের অন্যতম পুরোধা। কল্লোল, কালিকলমের নিয়মিত লেখক হলেও তিনি স্বতন্ত্র ধারার কথাকার। প্রমথনাথ ও জগদীশ গুপ্ত দুজনেই বঙ্কিমানুসারী কথা সাহিত্যিক। জগদীশ গুপ্তকে সমালোচক শরৎচন্দ্রের গোত্রজ বলে থাকলেও তিনি আপন প্রভায় সমুজ্জ্বল। বঙ্কিমের নিয়তি ও প্রবৃত্তির তাড়নাপীড়িত মানব মনের আকর্ষণ বিকর্ষণকে আত্মস্থ করে সাহিত্য জগতে তাঁর আবির্ভাব। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাহিত্যে যে রুচিবোধের জন্ম হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানালেন জগদীশ গুপ্ত।

রবীন্দ্রোত্তর কথা সাহিত্যে দুএক জন শিল্পী ব্যতীত কেউ হয়তো ফ্রয়েডীয়

যৌনমনস্তত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারে নি। এই ভাবধারার পূর্বসূরী হিসেবে জগদীশ গুপ্তের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত। ফ্রয়েডের সৌন্দর্যতত্ত্ব, মানসক্রিয়ার দেহভিত্তিক যৌন চেতনা, চরিত্র ও ভাষাচিত্রের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অভিনব চিন্তাধারার সঙ্গে কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের পুরোধা লরেন্স, হ্যামসুন, জোহান বোয়ার এর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে ছিল সুদূর প্রসারী। জগদীশ গুপ্তের লেখনীতে এই সব বৈশিষ্ট্য ধ্রুবতারার মতো প্রোজ্জ্বল ছিল বলেই আধুনিক শিল্পীরা তাঁর প্রবর্তিত রাজপথেই পরিক্রমনশীল। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন —

" জগদীশ গুপ্ত 'কল্লোলে'র কালবতী এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে কল্লোলের যে মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিল, তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনাতেই অভিব্যক্ত।" [৩৪]

যাইহোক আমার আলোচ্য বিষয় প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের তুলনা। প্রমথনাথ বিশী ঐতিহ্যের বিশ্বাসী। পুরানো পটভূমিতেই শুধু নয় প্রমথনাথ নতুন ভূমির সন্ধান করেননি একথা বললে অবিচার করা হবে। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'চলনবিল', 'অশ্বত্থের অভিশাপ' 'কোপবতী' এগুলো উপন্যাসের পটভূমি নূতনত্বের দাবী রাখে। জোড়াদীঘি, চলনবিল, ধুলোউড়ি, তালবনী, চরচিলমারীর উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারকেন্দ্রিক মানবজীবনের পটভূমিকেন্দ্রিক উপন্যাস নিঃসন্দেহে অভিনব। জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাসে প্রচলিত পুরনো পটভূমিকে পরিহার করে নতুন পরিবেশ ও পটভূমিকে বেছে নিয়েছেন। রহস্যাচ্ছন্ন মানব চরিত্রের অন্তর্গূঢ় অন্ধকারময় দিক বিশেষত অন্যায়, অপরাধ, প্রবঞ্চনা স্বার্থকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনদর্পণে তুলে ধরেছেন। এজন্য হয়তো তাকে বক্র কূটিল তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়েছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে দুঃখবাদ ঘনীভূত হয়ে ওঠে নি তবে নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ঘটে নি। তাঁর সৃষ্ট দুএকটি চরিত্র এ প্রসঙ্গে বিচার্য। লালকেল্লা উপন্যাসে

স্বরূপরামের নৈরাশ্যবাদ, বিমল ও ফুল্লরার নৈরাশ্যবাদ, কঙ্কণের জীবনযন্ত্রণা এই ধারারই ফলশ্রুতি। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে তা হল দুঃখবাদ। দুঃখবাদের অংশ স্বরূপ বিষন্নতা, হতাশার জন্য যদিও তিনি কোন একক ব্যক্তিকে কিংবা সমাজকে অভিযুক্ত করেননি। তিনি এই দুঃখবাদের পেছনে নিয়তির নির্মম পরিহাস বলে স্বীকার করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমি হিসেবে যুগের উত্থান পতনের চিত্র আমন্ত্রিত হয়েছে। সমকালীন যুগ তাঁর সাহিত্যে দুর্লভ নয়। তাঁর দু একটা উপন্যাসে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় উত্থাপিত হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর দিক আলোচিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলো তার সাক্ষ্যবহ। কিন্তু জগদীশগুপ্তের উপন্যাসে বৃহত্তর সমাজ ও জাতীয় ভাবনার প্রতিফলন ঘটেনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, পারিবারিক সামান্য ক্ষেত্রে সমাজ জীবনের সমস্যাই বিধৃত হয়েছে যার পরিণতি ঘটেছে দুঃখবাদে। যুক্তি হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন সমাজ পরিবর্তন শীল সভ্যতার উত্তরণ প্রতিনিয়ত ঘটছে। অথচ ব্যক্তির মহৎ আকাঙক্ষা পরিবেশের পারিপার্শ্বিক চাপে চরিতার্থ হতে পারছেনা এজন্যই ব্যর্থতা নেমে আসছে ব্যক্তিজীবনে। 'লঘুগুরু' উপন্যাসে উত্তমের ব্যর্থতা, 'অসাধু সিদ্ধার্থে' সিদ্ধার্থের ব্যর্থতা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ব্যক্তিজীবনে জগদীশ গুপ্তকে কোর্টের চাকরি করতে গিয়ে সম্বলপুর, বোলপুর, পাটনা, কুষ্টিয়া, স্বগ্রাম, মেঘচামীর বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। পল্লীজীবনের প্রতি অভিজ্ঞতার আলোকে ও কর্মসূত্রের অভিজ্ঞতায় একাধারে তার মানসিকতায় গড়ে উঠেছিল মমত্ববোধ ও নিষ্ঠুরতা এই দ্বৈত সত্তা।

প্রমথনাথ বিশী ও জগদীশ গুপ্ত দুজনেই ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসী। পরন্তপ

চাঁপার উদগ্র প্রেম লালসা, রুমালী জীবনলালের দেহগত কামনা, প্রেমের অনুষঙ্গে সীতা নীপেশবাবু, বিনয় কঙ্কণ, বিমল ফুল্লরার দেহজ কামনা ফ্রয়েডীয় ভাবনার প্রতিফলন। ফ্রয়েডের নিষ্ঠাবান পাঠক জগদীশ গুপ্ত মানবমনের অচেতন অবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বুঝেছেন প্রেমের মূলে দেহকামনাই সবচেয়ে বড়, প্রেমের উদ্ভব ঘটেছে এই দেহকেই ঘিরে। অসাধু সিদ্ধার্থ, লঘুগুরু, দুলালের দোলা, মহিষী, রতি ও বিরতি, গতিহারা জাহ্নবী, সুতিনী, রোমন্থন, দয়ানন্দ ও মল্লিকা 'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসে দেহকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসে প্রেমের উদ্ভব ঘটেছে তার পরিণতিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এসেছে দুঃখবাদ যদিও এর জন্য অমোঘ নিয়তিকেই মেনে নিয়েছেন।

প্রমথনাথের উপন্যাসে পুরুষ ও নারী চরিত্রের তুলনামূলক বিচারে উভয় শ্রেণীর চরিত্রের উপর সমগুরুত্ব আরোপ করেছেন কিন্তু জগদীশ গুপ্ত পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে নারী ও পুরুষ চরিত্রের মনোগহনে প্রবেশের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল সর্বাধিক। এজন্য একক চরিত্র কেন্দ্রিক উপন্যাস তার কলমে লেখা হয়নি। তাঁর উপন্যাসে দুটি তিনটি মুখ্য চরিত্র দেখা গেছে। প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে মুখ্য চরিত্রের আধিক্য থাকলেও পার্শ্ব চরিত্রগুলি উপেক্ষিত হয়নি অনেক ক্ষেত্রে তারা সক্রিয়তা ও সজীবতার সৃষ্টি করেছে।

জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য জগতের চরিত্রগুলির মধ্যে সিংহভাগ চরিত্র নিম্নশ্রেণীর পতিত, শঠ, প্রতারক, আদিম লালসা যুক্ত, পাশবিক গুণ সম্পন্ন পুরুষ, যৌনক্ষুধা তাড়িত নরনারী তবে তারা সৎ ও সুখী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও নিয়তি তাদের সুস্থ জীবন গঠনের অন্তরায়। প্রমথনাথের উপন্যাসে শঠ চরিত্র আছে বনওয়ারীলাল, চন্ডীবক্সী, পরন্তপ এরা, তবুও এদের পাশাপাশি স্নেহশীলা জননী, সন্তানবৎসল পিতা, কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য,

সমাজ সেবী, স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি স্থান পেয়েছে।

প্রমথনাথ ও জগদীশ গুপ্তের প্রেম ভাবনা এপ্রসঙ্গে আলোচ্য। প্রমথনাথের উপন্যাসে প্রেম বর্ণময় হয়ে উঠেছে। পূর্বরাগ, অনুরাগ ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করে মিলনের পর্যায়ে এসেও অনেকক্ষেত্রে বিয়োগান্তক পরিণতি বহন করেছে। তুলসী, কঙ্কণ, রেশমী এদের প্রেম বিবাহের স্তরে পৌঁছায় নি। বলাবাহুল্য তুলসী ব্যতীত প্রত্যেকেরই প্রেমের সঙ্গে দেহজ সম্পর্ক যুক্ত হয়েছে এটা মূলত ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাব। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে প্রমথনাথের মতো প্রেমের মধুর রূপ ফুটে ওঠে নি। কিংবা কোন দেহাতীত প্রেমের চিত্র নেই তার প্রেমে আছে অদম্য লালসা, দেহাশ্রিত যৌন কামনা ও প্রেমের অন্তর্দাহ। প্রমথনাথের উপন্যাসের মতো ত্যাগ, তিতিক্ষা, আধ্যাত্মিক অনুভাবনা এখানে নেই।

জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু' উপন্যাসের রূপসী বারাঙ্গনা সুন্দরীর জীবনভাবনা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেঃ

" আমি তো বলি পাপ পুণ্যি বলতে কিছু নেই, শরীরের সুখই সুখ, মনের সুখও শরীরের সুখ দিয়ে আসে। "

- এখানে কোন নীতিবোধ স্থান পায়নি। সুন্দরীর এই জীবনদর্শনের সঙ্গে লালকেল্লা উপন্যাসের রুমালীর জীবনভাবনা সমধর্মী। ব্রিজম্যান রুমালীকে বলেছে —

" নিজের আত্মাকে অপবিত্র করছ কেন ?"

রুমালী প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে —

" ভোগ করে তো দেহ, আত্মা অপবিত্র হতে যাবে কেন ?"

- রুমালীর মনে পাপবোধ নেই সে শাহজাদার কাছে বাধ্য হয়ে নয় কিংবা অর্থের

জন্য নয় একমাত্র সুখের জন্যই যেত। 'লঘুগুরু'র সুন্দরীর সঙ্গে রুমালীর যোগসূত্র রয়েছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে নিয়তিবাদ এসেছে কাহিনীর কার্যকারণ সূত্র ধরেই। তিনি নিয়তিবাদকে অস্বীকার করেন নি। বিমল, কঙ্কণ, রুমালী, জীবনলাল, স্বরূপরাম প্রত্যেকটি চরিত্রের বিয়োগান্তক পরিণতির পেছনে নিয়তির ভূমিকা ছিল দুর্লঙ্ঘনীয়। বিকারগ্রস্ত বিমল, উন্মাদিনী চাঁপা, রেশমীর নগ্নদেহের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের 'রতি ও বিরতি'র বিকৃত মস্তিষ্ক চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

প্রমথনাথ প্লট ও আখ্যানভাগ গঠন সম্পর্কে সচেতন শিল্পী। আখ্যান শৈথিল্য কোথাও নেই। অপরদিকে জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে আখ্যান শৈথিল্য একটি অন্যতম ত্রুটি। আসলে প্লট ও আখ্যান গঠনের ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত ছিলেন উদাসীন।

প্রমথনাথ প্রকৃতি সচেতন শিল্পী - কাব্যগুণ ও নাট্যগুণ তার উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে প্রকৃতির কোন ভূমিক নেই কাব্যগুণ সেখানে উপেক্ষিত তবে তার সাহিত্যে নাট্যগুণ বর্তমান।

পরিশেষে প্রমথনাথের ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের ভাষাভঙ্গীর তুলনা করা যেতে পারে। প্রমথনাথ ও জগদীশ গুপ্ত দুজনেই বর্ণনা অংশে সাধুভাষা ও সংলাপ অংশে চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' ও পরবর্তী উপন্যাসে চলিত ভাষার ব্যবহার করেছেন প্রমথনাথ। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসে তৎসম শব্দের বাহুল্য স্থানে স্থানে দেশী ভাষার সুষম প্রয়োগ করেছেন প্রমথনাথ। শব্দ ব্যবহারের বাস্তবের পাশে অনেক ক্ষেত্রে রোমান্টিক জগৎ গড়ে তুলেছেন। আঞ্চলিক ভাষা , ইংরেজী ভাষা, হিন্দী ভাষা, নারীর মুখের ভাষা, বিশেষণের ব্যবহার, উপমার ব্যবহার, দৃশ্যবর্ণনার ভাষা, ভদ্র ও ভদ্রেতর ভাষা ব্যবহারে প্রমথনাথ দক্ষ শিল্পী।

জগদীশ গুপ্ত প্রথাবর্হির্ভূত বিষয়ে সঙ্গে প্রথাবর্হির্ভূত ভাষার ব্যবহারে সার্থক শিল্পী। বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কোন বাহুল্যতা না দেখিয়ে স্থানীয় মুখের ভাষাকেই সহজবোধ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ভাষায় কোন উচ্ছ্বাস নেই, অসমাপিকা ক্রিয়া ও কর্মপদের সার্থক ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য হল নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি যা সংবাদপত্রের বর্ণনার ভাষার মতো। অব্যয় ও লুপ্ত অক্ষরের স্থানে উর্ধ্বকমার ব্যবহার করেছেন যা দেখে জগদীশ গুপ্তের ভাষাকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল ঃ

(ক) "....কিশোরীর সই অপরার সৌন্দর্য অকিঞ্চনকে সরাসরি যৌন উত্তেজনা দান করেছে।"

(খ) "....বাদরের গলায় মুক্তার হার।", "....কিন্তু অকিঞ্চনের সম্বিৎ নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মত, থাকিয়াও নাই...."

পরিশেষে বলা যায় প্রমথনাথ ও জগদীশ গুপ্ত স্বতন্ত্র ধারার লেখক হলেও তাদের মধ্যে যোগসূত্র বর্তমান।

প্রমথনাথ বিশী ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রমথনাথ বিশী ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বয়সের দিক থেকে সমান ও দুজনেই কল্লোলের লেখক হলেও তাদের মধ্যে সমজাতীয়তা নেই। প্রমথনাথের সাহিত্যজীবনের পরিধির বিস্তৃতি যেমন ব্যাপক তেমনি বৈচিত্র্যময়। গ্রামীণ কৃষিসভ্যতার উন্মেষলগ্ন

থেকে ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের উদয়কাল পর্যন্ত এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস প্রমথনাথকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দান করেছে, সেখানে শৈলজানন্দ বাংলাদেশের বিশেষত বীরভূম ও বর্ধমানের পল্লীজীবনের সমস্যা, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস, নারীদের প্রচলিত সমাজকে ধরে রাখার প্রবণতায় পরিপূর্ণ প্রায় দ্বিশতাধিক উপন্যাসের মূল বিষয়। সামাজিক উপন্যাস রচনায় শৈলজানন্দের কলম ছিল সচল। তাই একজন ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত অন্যজন সামাজিক ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত।

প্রমথনাথ উত্তরবঙ্গের রূপকার। শৈলজানন্দ রাঢ় বঙ্গের রূপকার। 'ষোল আনা' উপন্যাসের শুরুতেই শৈলজানন্দ উত্তর পশ্চিম রাঢ়ের গ্রামীণ চিত্র অনবদ্য ভাবে তুলে ধরেছেন।

" বর্ধমান ও বীরভূমের সীমান্তপ্রান্তে ছোট্ট একটি গ্রাম - না আছে ডাক্তারখানা, না আছে ইস্কুল, না আছে পোষ্টাফিস - রেললাইন হইতে অনেক দূরে। "

প্রমথনাথের উপন্যাসে অতীত ঐতিহ্যবাহী সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন সেখানে শৈলজানন্দ সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত সম্পর্কে নীবর থেকেছেন। 'ষোলা আনা', 'আকাশকুসুম', 'বাংলার মেয়ে', 'কয়লাকুঠির দেশ', 'হাসি', 'জননী', 'নন্দিনী', 'নারীমেধ', 'বধূবরণ', 'গঙ্গাযমুনা', 'সাঁওতালী মাটির রাজা', 'মারণ মন্ত্র', 'ঝড়ো হাওয়া', 'অপরূপা', 'বিজয়া', 'শহর থেকে দূরে', 'দিন মজুর' প্রভৃতি উপন্যাস নির্মম বাস্তব হলেও সমাজ পরিবর্তনের কথা নেই।

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে জগৎ ও জীবনের সমস্যা যেমন প্রধান হয়ে উঠেছে শৈলজানন্দের উপন্যাসে বৃহত্তর কোন সমস্যা নেই। প্রমথনাথের উপন্যাসে সামাজিক ও

অর্থনৈতিক ভাঙ্গনের সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, সতীদাহ প্রথার সমস্যা, দেহমনের সমস্যা, বিলীয়মান জমিদারী ব্যবস্থা, মোঘলসাম্রাজ্যের অবক্ষয় প্রভৃতি সমস্যাই প্রাধ্যান্য পেয়েছে। সেখানে শৈলজানন্দের 'গঙ্গাযমুনা', উপন্যাসে সতীনের জীবনের সমস্যা, 'ঝড়োহাওয়া' ও 'নন্দিনী' উপন্যাসে নারী নির্যাতনের সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা ও জমিদার বাড়ীর অন্তঃপুরের সমস্যাই প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে শৈলজানন্দ কল্লোলের 'ভাবের আকাশের ঝড়কে' অস্বীকার করে 'মাটির পৃথিবীর জীবনের বন্যাকে' গুরুত্ব দিলেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তারাশঙ্করের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণারূপে শৈলজানন্দের উল্লেখ করে বলেছেন —

'' খুঁজে পেল সে মাটিকে, মলিন অথচ মহত্বময় মাটি; খুঁজে পেল সে মাটির মানুষকে, উৎপীড়িতঅথচ অপরাজেয় মানুষ'', [৩৫]

- তারাশঙ্কর প্রেরণাদাতারূপে শৈলজানন্দের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।

প্রমথনাথ বিশী আঞ্চলিক জীবনের আঞ্চলিকতা সম্পর্কেও সচেতন। পটভূমি সচেতনতা তার মধ্যে সুস্পষ্ট। 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'চলনবিল', 'অশ্বত্থের অভিশাপ', 'পদ্মা', 'কোপবতী' উপন্যাসে স্থানিক বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সংস্কার, বিশ্বাস, লোকউৎসব, ছড়া, প্রবাদ প্রবচন সহ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শৈলজানন্দও তেমনি 'বাংলার মেয়ে' , 'রাঙা শাড়ি', 'কাকনতলার মেয়ে', 'শোভাযাত্রা', 'ষোল আনা', 'কয়লা কুঠির দেশ' উপন্যাসে উত্তর পশ্চিম রাঢ়ের গ্রাম্যজীবনের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আদিমতা গন্ধী জীবন, কুসংস্কার, লোভ, প্রেমভালোবাসা, সাঁওতালী ও বাউড়িদের ভাষা ফুটে উঠলেও সার্বজনীনতার সুর প্রতিধ্বনিত না হওয়ায় সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেণীভুক্ত হয়ে ওঠে নি।

প্রমথনাথের উপন্যাসের চরিত্ররা বেশির ভাগ সংঘাতে লিপ্ত কেউ সামাজিক কেউ রাজনৈতিক সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত। সুখী দাম্পত্য জীবনের ছবি প্রায় অনুপস্থিত - প্রমথনাথের উপন্যাসের এটা একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য। নারী চরিত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই বিদ্রোহিণী। রেশমী, রুমালী, ইন্দ্রাণী, চাঁপা এরা প্রত্যেকেই বিদ্রোহিণী নারী। পাশাপাশি শৈলজানন্দ সৃষ্টি চরিত্র কোন অস্তিত্বের সংকটে কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতে লিপ্ত নয়। তাঁর উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলি বিদ্রোহিণী সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে নি। বরং অনেকক্ষেত্রেই তারা নির্যাতিত হয়েছে নীরবে তারা গভীর বেদনাকে সহ্য করেছে। 'বাংলার মেয়ে' উপন্যাসে মিনতির একটি সংলাপ —

" নিজের ইচ্ছায় তো কোন কাজ করবার জো নেই। অচলা, আমরা যে বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে জন্মেছি ভাই।।" [৩৬]

নারীশিক্ষার তেমন প্রসার ঘটে নি, পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা বিদ্রোহ করে নি, রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় তারা অন্তঃপুরের বাসিন্দা।

প্রমথনাথ ও শৈলজানন্দের উপন্যাসে বঙ্কিমী প্রভাব দুর্লভ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের নারীরা সৌন্দর্যময়ী, ঠিক তেমনি প্রমথনাথ ও শৈলজানন্দের উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে অবস্থান করেছে এক অসামান্যা রূপসী নারী। ফুল্লরা, কঙ্কণ, ইন্দ্রাণী, রুমালী, রেশমী, তুলসী, শুভ্রা, রুক্মিণী প্রত্যেকেই সৌন্দর্যময়ী। প্রমথনাথ উপন্যাসে তাদের রূপ বর্ণনা করতে ভোলেনি। শৈলজানন্দের 'বাংলার মেয়ে' উপন্যাসের মিনতি, 'হোমানল' উপন্যাসের ঊষা, 'ষোল আনা'র রুক্মিণী, 'আকাশ কুসুম' এর নায়িকার রূপ প্রসঙ্গে শৈলজানন্দের বর্ণনা —

" মেয়ে তাহার বিধবা হইলে কি হয়, অমন সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না -

এত রূপ! দাঁড়াইয়া দুদন্ড দেখিবার মত চেহারা।''[৩৭]

প্রমথনাথের চিত্রনাট্যধর্মী উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক ছিল না। সাধু ও চলিতরীতি দুটোকেই উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। নাট্যধর্মী সংলাপ, বিশ্লেষণাত্মক ও আবেগাত্মকভাষা, কবিত্বপূর্ণ উপলব্ধি প্রমথনাথের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। তবে তিনি আঞ্চলিক ভাষাকে উপন্যাসে বেশি স্থান দেন নি। অপরদিকে শৈলজানন্দ ছিলেন চিত্রনাট্য রচয়িতা ও চিত্রপরিচালক। এজন্য পাঠকের চাহিদা ও চলচ্চিত্রের কথা চিন্তা করে চিত্রনাট্যোপযোগী সহজ সরল আবেগমিশ্রিত ভাষার ব্যবহার করেছেন। 'মানে না মানা', 'নন্দিনী', 'শহর থেকে দূরে' প্রভৃতি চলচ্চিত্র তৎকালীন যুগরুচির পরিচয়বহ। শৈলজানন্দ আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ষোল আনা' উপন্যাসের একটি আঞ্চলিক ভাষার দৃষ্টান্ত ঃ

''. . . না হে না, ই হাঁসির কথা লয়, - হেঁসো না মাইরি! আজ ছটি মাস হ'ল, মানে কথা, সেই উয়ার লাত্‌নির যখন 'ব্লিড ডাইসেনট্রিক' হয়, তখন তিনটি দিনের 'বিজিট' - তিন আটে, ধরে লাও কেনে দ্যাড় টাকা।''[৩৮]

শৈলজানন্দের মতো প্রমথনাথ বীরভূমের আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন ইয়ে, যাবেক, দিলেক, ভাববেক, করবেক ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় প্রমথনাথ ও শৈলজানন্দ দুজনেই বিচিত্রস্বাদী উপন্যাস রচনা করেছেন তবে প্রমথনাথ যেখানে বুদ্ধিপ্রধান ঔপন্যাসিক শৈলজানন্দ সেখানে হৃদয়ধর্মকে গুরুত্ব দিয়েছেন এখানেই দুজনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য।

প্রমথনাথ বিশী ও মনোজ বসু
তুলনামূলক পর্যালোচনা

বাংলা সাহিত্যে উত্তরবঙ্গের রূপকার রূপে প্রমথনাথ বিশী এবং এবং দক্ষিণবঙ্গ বিশেষত সুন্দরবনের রূপকার রূপে পরিচিত মনোজ বসু,দুজনেরই জন্মকাল ১৯০১, দুজনেই 'কল্লোল' ধারার লেখক, দুজনেই বৈচিত্র্য সন্ধানী শিল্পী, দুজনেই যুগযন্ত্রণার শরিক হয়ে স্ব স্ব মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির নৈকট্য ও বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রমথনাথ ও মনোজ দুজনেই আপাত বৈচিত্র্যহীন পল্লীজীবনের মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন, দুজনেই নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতাকে ভালো চোখে দেখেননি বলেই পল্লীবাংলার জীবনধারাকে তিল তিল করে তিলোত্তমা মূর্তি গড়ে তুলেছেন। এই মূর্তি কখনো ঐতিহ্যের প্রতি সমাহিত, কখনো বা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে হয়েছে বিন্যস্ত। তবে বৈচিত্র্যতার দিক থেকে মনোজ সম্ভবত প্রমথনাথকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন।

প্রমথনাথের জমিদার জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'চলনবিল', 'অশ্বত্থের অভিশাপ' এ অতীত জীবনকেন্দ্রিক জমিদারদের উত্থান পতনের ইতিহাস বর্ণনায় অসামান্য শিল্পসুষমায় মন্ডিত। প্রমথনাথ এখানে জমিদারদের শৌর্য, বীর্য, নেতৃত্বদানের কৌশলকে সহানুভূতির সঙ্গে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তেমনি মনোজ বসুর 'শত্রুপক্ষের মেয়ে', 'স্বর্ণসজ্জা' উপন্যাসে জমিদারী আভিজাত্য ও বিলাস বৈভব, দ্বন্দ্ব সংঘাত নিপুণ তুলির টানে চমৎকার রসসৃষ্টি করেছে। প্রথমটিতে চৌধুরী বাড়ির জমিদার নরহরির সঙ্গে শিবনারায়ণের দ্বন্দ্বের কাহিনী, দ্বিতীয়টি রায়বাড়ির জমিদার চন্দ্রভানু তারা

প্রত্যেকেই ছদ্মবেশে ডাকাত। জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের উদয়নারায়ণ যেমন দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল পুষে জমিদারী রক্ষা করেছে তেমনি মনোজ বসুর 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের জমিদাররা ডাকাতি করে বিত্ত সম্পত্তি গড়ে তুলে লাঠিয়ালের সহায়তায় তা রক্ষা করেছে সেদিক থেকে উপন্যাসের সাদৃশ্য খুঁজতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

প্রমথনাথের 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসের আঞ্চলিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মনোজের 'জলজঙ্গল' ও 'বন কেটে বসত' উপন্যাসের মধ্যে কিছুটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মনোজের উপন্যাস দ্বয়ে সুন্দরবনের রুদ্র প্রকৃতি ভয়ঙ্কর জীবনের বেপরোয়া আদিমতা, সংস্কার, বিশ্বাস, প্রেম, প্রতিহিংসা, বাৎসল্য, নগ্নদেহ কামনা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। আলোচ্য উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়, সর্পকুমির বেষ্টিত সুন্দরবনের দুর্গম লবনাক্ত জলাভূমিতে চাষবাসের শুরু, ধীবরদের সংগ্রামী জীবন একভাবে চলে যাচ্ছিল সেখানে ধনতন্ত্রের প্রতীক স্বরূপ একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষের ষড়যন্ত্রে উৎখাত হয়ে নতুন ভাবে অজানা দুর্গম পরিবেশে আবার তাদের সংগ্রামী জীবন শুরু করে। মাটি ও মানুষের সঙ্গে এখানে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে 'চলনবিল' উপন্যাসে দর্পনারায়ণের প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করে বাঁধ নির্মাণ করে কৃষিযোগ্য জমিতে পরিণত করবার ঘটনার সৌসাদৃশ্য। তবে দুই শিল্পীর মধ্যে পার্থক্য হল একজন প্রাকৃতিক শক্তির ক্রীড়নক রূপে অন্যজন বহিরাগত শক্তির প্রতীকরূপে বিচার করেছেন। প্রমথনাথের 'পদ্মা' উপন্যাসে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মনোজ 'জলজঙ্গল' উপন্যাসের ভূমিকা অংশে লিখেছেন —

"জলজঙ্গলে এই সুন্দরবনের বাদাবনের হাসিকান্না আর সংগ্রামের কাহিনী লিখেছি। মাটি জল আর মানুষ সব একাকার।" [৩৯]

শহরজীবনের কৃত্রিমতাকে প্রমথনাথ ও মনোজ সমর্থন জানান নি। প্রমথনাথের 'পদ্মা' উপন্যাসের নায়ক বিনয়ের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তার দৃষ্টান্ত। মনোজবসুর 'জলজঙ্গলে'র মনোহর ডাক্তার প্রশ্ন করেছে —

" বলি আছে কি শহরে ? গাদা গাদা পোড়া ইট রসকস যা কিছু হাজার লক্ষ মানুষ আগে ভাগে শুষে মেরে দিয়েছে। "

প্রমথনাথ ও মনোজ দুজনেই আবেগময় দেশাত্মবোধক উপন্যাসে রোমান্টিকতার সুর প্রতিফলিত। 'দেশের শত্রু' 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে নিপুণভাবে স্বদেশী চরিত্রগুলোকে এঁকেছেন। মনোজ বসুও ইতিহাসের জীবন্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন 'সৈনিক', 'আগষ্ট ১৯৪২', 'দুঃখনিশার শেষে', 'প্লাবন', 'ভুলি নাই', 'বাঁশের কেল্লা', 'পথ কে রুখবে?', 'রক্তের বদলে রক্ত' উপন্যাসে।

প্রমথনাথের বঙ্গভঙ্গ উপন্যাসের শচীন, সুশীল, অবিনাশ, 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে শচীন সুশীল, ভূপতি, অরবিন্দ, শুভ্রা, রুক্মিণী, রাধা, মলিনার সুখ দুঃখ, আত্মত্যাগের মধ্যে স্বাধীনতার স্বাদ খুঁজে ছিল। ঠিক তেমনি মনোজের 'ভুলি নাই' উপন্যাসের বিপ্লবী সোমনাথ দত্ত, 'আগষ্ট ১৯৪২' এ অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মহীন, 'সৈনিক' উপন্যাসের পান্নালাল পরাধীনতার নির্মম যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে আত্মবলিদান করেছে - এরূপ অসংখ্য আত্মোৎসর্গীকৃত মানুষের মিছিলে পরিপূর্ণ উপন্যাস। এর মধ্যেও তরুণ প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ের বেদনা ও আশাবাদের স্বপ্নকে শিল্পরূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক সুকৌশলে। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অত্যাচারের কাহিনী আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। দুজন শিল্পীর কলমেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতীয় শিক্ষায় মহাত্মাজীর নঈতালিমের প্রতি আনুগত্য, চরমপন্থী নরমপন্থীদের কার্যকলাপ,

আগষ্ট বিপ্লব, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ক্ষমতালোভী নেতৃবৃন্দের সম্যক পরিচয় দিয়েছেন উপন্যাসগুলোতে।

মনোজবসু নাগরিক জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ - প্রমথনাথের 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসে নাগরিক জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তৎকালীন বাবুসমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার সার্থক দৃষ্টান্ত। মনোজবসুর 'আমার ফাঁসি হল' উপন্যাসের নায়ক কলকাতা শহর প্রসঙ্গে বলেছে — ''সারবন্দি যত ইটের খাঁচা পোকা মাকড়ের মত মানুষ তার মধ্যে কিলবিল করে। খটখটে বাঁধা রাস্তাগুলো জুতোর তলায় যেন মুগুর মারছে প্রতিপদে। বিশ্রী বিশ্রী।''

প্রমথনাথ ও মনোজের প্রেমভাবনার স্বরূপ এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রমথনাথ রোমান্টিক প্রেমানুভূতির পরিচয় দিলেও সে প্রেম মাধুর্য পূর্ণ হয়ে ওঠে নি যেখানে প্রধান হয়ে দেখাদিয়েছিল বিরহ যন্ত্রণা। তাঁর কোন উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেমের সুমধুর চিত্র নেই। পাশাপাশি মনোজবসুর 'ওগো বধূ সুন্দরী', 'এক বিহঙ্গী' 'বৃষ্টি বৃষ্টি' 'সাজবদল' প্রভৃতি উপন্যাসে রোমান্টিক প্রেম পরম মাধুর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এখানেই প্রমথনাথের সঙ্গে মনোজের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য।

প্রমথনাথের নাগরিক জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস বলতে গেলে খুবই কম পাশাপাশি মনোজের 'চাঁদের ওপিঠ', 'রাণী', 'সেতুবন্ধ' প্রভৃতি উপন্যাসে নাগরিক জীবনের অপচয় মর্মস্পর্শী ট্র্যাজিক পরিণতি দান করেছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে চলনবিলের ডাকাতজীবন কাহিনী স্থান পেয়েছে যেখানে মনোজ চোর সমাজের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক ভাবে বর্ণনা করেছেন।

প্রমথনাথের উপন্যাসে শিক্ষক চরিত্র বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। কলেজ শিক্ষক

কেরী, রামরাম, মৃত্যুঞ্জয়, রামনাথ বাচস্পতি, টোলের ভট্টাচার্য পন্ডিত, স্বদেশ প্রেমিক শিক্ষক অবিনাশবাবু, অধ্যাপক অবিনাশ প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষক চরিত্রের আদর্শবাদ প্রচারিত হয়েছে। মনোজ বসুর 'মানুষ গড়ার কারিগর' স্কুল শিক্ষক জীবনের ঘটনা। 'নবীন যাত্রা' উপন্যাসটিতে গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ বর্ণিত হয়েছে। গান্ধীজী বলেছেন —

" শিক্ষক হবেন চুম্বকের মত, ছেলেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তিনি এমন হবেন যাতে ছেলেরা তাকে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে চায়না। . . . "

'মানুষ গড়ার কারিগর' উপন্যাসে শিক্ষক জীবনের বঞ্চনা ও দারিদ্রের চিত্র বর্ণিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় প্রমথনাথের তুলনায় বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে মনোজ বসু এগিয়ে থাকলেও আঙ্গিক সচেতনতার দিক থেকে প্রমথনাথ বিশিষ্টতার দাবী রাখেন।

প্রমথনাথ বিশী ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের তুলনামূলক পর্যালোচনা

বয়সের দিক থেকে কথাসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের চেয়ে দুবছরের প্রবীন, দুজনেই সমকালবর্তী লেখক কিন্তু দুজনের সাহিত্য সমধর্মী নয়। অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু এই কল্লোল ত্রয়ীর অন্যতম পুরোধা হিসেবে অচিন্ত্যকুমারের পরিচয়। প্রমথনাথ বিশী কল্লোলের লেখক হলেও কল্লোলের সাধর্ম তেমনভাবে তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয় নি। তবুও প্রমথনাথের রচনায় ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রাধান্য, পল্লীচিত্র, প্রেমে অনাস্থা , রোমান্টিসিজিমের মোহ, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন

ঘটেছে। মূলত প্রমথনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখক একটা বৃহত্তর যুগের ঘটনাপ্রবাহকে সাহিত্যে স্থান দিতে গিয়ে তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অতীত ঐতিহ্যের দিকে তবুও দুএকটি উপন্যাসে কল্লোলের প্রতিধ্বনি যে বেজে ওঠে নি এমন নয়, বিশেষত 'কোপবতী' ও 'পদ্মা' উপন্যাসদ্বয়ে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য উচ্চারিত হয়েছে সন্দেহ নেই। অচিন্ত্যকুমারের উপন্যাসে পূর্বোক্ত কল্লোলযুগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বোহেমিয়ানিজম ও প্রবল মিথুনাসক্তি, মধ্যবিত্তের সঙ্কট, যুদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাব ও নারীজীবনের আকাঙক্ষা প্রভৃতি কল্লোলকালীন প্রবণতার ছবি উচ্চারিত হয়েছে। বলাবাহুল্য অচিন্ত্যকুমার ছিলেন অভিজ্ঞতার শিল্পী। তাঁর হাকিমী জীবনের অভিজ্ঞতার সূত্রে এজলাসে দেখেছেন নিষ্ঠুরতা, রিরংসা, মিথ্যা, ষড়যন্ত্র, লোভী মানুষদের, সেই সঙ্গে কার্যোপলক্ষে বিচিত্র জনজীবনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক পরিচয় যা তাঁর সাহিত্যের দর্পণে প্রতিবিম্বিত। রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে অচিন্ত্যকুমারকে জানিয়েছেন —

" তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি, তোমার শক্তির বিশিষ্টতা আছে।" [৪০]

তবে মিথুনাসক্তি ও উপমার আধিক্যের কথা বলেছেন। অচিন্ত্যকুমার বিশ্বাস করেন - "সাহিত্য জীবনের জন্য নয়, সাহিত্যের জন্য ।... সাহিত্যের মূল মন্ত্র হল নিরাবধিকালের জন্য নৈবেদ্য সাজানো।"[৪১]

প্রমথনাথের সাহিত্যে যুগের বিদ্রোহ উচ্চারিত যেমন নারীস্বাধীনতা ও পুরুষের সমধর্মিতা প্রভৃতি তেমনি অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যেও এই বিদ্রোহ সমভাবে উচ্চারিত হয়েছে। অচিন্ত্যের 'প্রাচীর ও প্রান্তর' এবং 'আসমুদ্র' উপন্যাসে নারীমুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সঙ্গে প্রতিবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে। 'প্রাচীর ও প্রান্তরের' কিটি, 'আসমুদ্রের' বনানী, 'ছিনিমিনি'তে সীতা, 'ইন্দ্রাণী' উপন্যাসের ইন্দ্রাণী, 'দিগন্ত' উপন্যাসের

মেইজি, 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' উপন্যাসে অশ্রু, 'অনন্যা' উপন্যাসে বীথি প্রত্যেকেরই বিদ্রোহ মূলত কল্লোল যুগের বিদ্রোহ। প্রমথনাথের 'পদ্মা' উপন্যাসের কঙ্কণ ও পারুল, 'কেরীসাহেবের মুন্সী'র রেশমী, 'লালকেল্লা'র রুমালী, 'বঙ্গভঙ্গের' মলিনা, 'পনেরোই আগষ্টে'র শুভ্রা, 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারে'র ইন্দ্রাণী ও 'অশ্বত্থের অভিশাপ' এর মুক্তামালা প্রত্যেকেই বিদ্রোহিণী নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লক্ষণপুষ্ট।

প্রমথনাথের উপন্যাসে যাযাবরত্ব বা বোহেমিয়ানিজম সোচ্চার হয়ে ওঠে নি। 'হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোন খানে' এই জীবনবোধে নায়ক নায়িকা চরিত্রে জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। বিনয় কঙ্কণের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুললেও পারুলকে স্ত্রীরূপে পেতে চেয়েছে, দর্পনারায়ণ বনমালাকে বিয়ে করেও ইন্দ্রাণীকে ভুলতে পারেন নি, জন তার কবি, কেটিকে ছেড়ে রেশমীর প্রতি আসক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু কেউই একঘাট পেরিয়ে অন্য ঘাটে পৌঁছাতে পারে নি। যদিও এর পিছনে ফ্রয়েডীয় ভাবনার উপস্থিতি।

অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'র নায়ক কাঞ্চনের মধ্যে বোহেমিয়ানিজম সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে তার নায়িকা ছয়টি একে একে একঘাট পেরিয়ে অন্যঘাটে এসেছে তারা আহ্লাদি, আসমানি, বাতাসি, মুক্তা, বনজ্যোৎস্না ও মৈত্রেয়ী - আবার নায়ক ছুটেছে নতুন কিছুর সন্ধানে পরম অন্বেষণের দিকে। 'কাকজ্যোৎস্না'র নমিতা - জীবন, 'মুখোমুখি'তে গৌরী, 'অন্তরঙ্গ' উপন্যাসে হিমাদ্রী পরম অন্বেষণের জন্য ছুটেছে। অচিন্ত্যের বোহেমিয় ভাবনার সঙ্গে যৌনচেতনা অবলীলাক্রমে যুক্ত হয়েছে।

প্রমথনাথ ও অচিন্ত্যকুমার সমাজধর্মের চেয়ে হৃদয়ধর্মকেই বড় করে দেখলেও অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যে বিবাহের কয়েকটি মন্ত্রঃপুত বাক্য সেখানে তুচ্ছ। নায়ক নায়িকার স্বাধীন সত্তার কাছে সতীত্ব, সামাজিক অনুশাসন তুচ্ছ হয়ে গেছে। বৈধব্য প্রেম প্রবল

ভোগাকাঙক্ষা নিয়ে এগিয়ে যায় সমাজকে উপেক্ষা করে তাই সামাজিক সংকীর্ণতার কাছে ব্যক্তিজীবনের কামনা বাসনাই সোচ্চার হয়ে ওঠে। সেখানে প্রমথনাথ সমাজকে, সামাজিক সংস্কারকে উপেক্ষা করেন নি। বালবিধবা কুসুমিকে কৈশোর প্রেমের ভাবালুতার মধ্যে এক ট্র্যাজিক পরিণতি দান করেছে এখানেই প্রমথনাথের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের পার্থক্য। অচিন্ত্যকুমারের 'কাকজ্যোৎস্না' উপন্যাসের উত্তেজিত নায়কের উক্তি — "জান, সমাজ আমরা সৃষ্টি করেছি আমরাই তাকে ভাঙবো, আমাদের ভাঙবার অধিকার না থাকলে আমরা তাকে মানবো কেন?"

এবারে আমরা দুজন শিল্পীর প্রেম চিত্র অঙ্কনের দিকে দৃষ্টি রাখবো। প্রমথনাথ বিশী ও অচিন্ত্যকুমার দুজনেই প্রেমচিত্র অঙ্কনের সফল শিল্পী। দুজনেরই প্রেমভাবনার সঙ্গে দেহের কামনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অচিন্ত্যকুমারের ভাষায় - 'প্রেমনহে কায়াহীন কথার ছলনা' এ প্রেম জীবনকে ভোগ করতে আগ্রহী - দেহ দেউলেই এই প্রেমের সমাপ্তি। নিজেকে হারিয়ে ফেলে নয় প্রকাশের মধ্যে এই প্রেমের চরিতার্থতা। 'কাকজ্যোৎস্না'র নায়কের কাছে তাই -

"সবার চেয়ে বড় প্রেম।" [৪২]

অচিন্ত্যের প্রেমে জ্বালা আছে ব্যর্থতা আছে তবুও জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান করছে প্রেমের সৌরভ। তবে প্রেম যৌন কামনা মুক্ত প্রেম নয়। প্রমথনাথের 'কোপবতী' 'পদ্মা', 'কেরীসাহেবের মুন্সী' 'লালকেল্লা' উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ত্বের প্রাধান্য।

প্রমথনাথ ও অচিন্ত্যকুমারের ভাষারীতির তুলনামূলক আলোচনা এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক। প্রমথনাথের ভাষার কাব্যময়তা, ইঙ্গিতময়তা, চিত্রকল্প, উপমার ব্যবহার, ইংরেজী সংলাপ, হিন্দী সংলাপ, স্ল্যাং ল্যাংগুয়েজ, মিশ্রভাষা, সংলাপধর্মী ভাষা, ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ

ভাষার সুষম প্রয়োগ ঘটেছে। সেখানে অচিন্ত্যকুমারের ভাষার কাব্যময়তা, উপমা অলঙ্কারের বাহুল্য, অস্বাভাবিক সংলাপ, ইতর ও বিদেশী শব্দের প্রয়োগ ও বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রমথনাথের বর্ণনামূলক গদ্যরীতির একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি অংশটি 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের মদ্যপ পরন্তপের বর্ণনা :-

" তার মুখে ভ্রুপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিনফিনে কালপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মস্‌লিনের বানিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চূনট করা উড়ানি এবং পায়ে বগলস-সমন্বিত পালিশ করা জুতা। যুবক বলিষ্ঠ, তেজস্বী, কিন্তু এতক্ষণে নিস্তেজ।"[৪৩]

পাশাপাশি অচিন্ত্যকুমারের 'প্রচ্ছদপট' উপন্যাসের বৈঠকখানার বর্ণনা :-

" ফরাস পাতা, নিচু জোড়া তক্তপোষে তেমনি সেই বৈঠকখানা, রবিবর্মার পুরোনো সেই ছবিগুলো তেমনি দেওয়ালে আজো ঝুলছে, দরজার উপরে উচু তাকের থেকে সিন্দুঁরচর্চিত চীনেমাটির সেই গণেশ ঠাকুরটি আজো ভ্রষ্ট হয় নি।"

প্রমথনাথের উপমার ব্যবহার .-

" কুসুমি বড় সুন্দরী, মুখখানা বড়ই সুন্দর, গালদুটি পুরন্ত, কণ্ঠে দুটি রেখা পড়েছে, রঙটা কচি গাবের পাতার মতো উজ্জ্বল স্বচ্ছ, ঠোটদুটো তাজা, কচি লাল রঙ ধরে ওঠা করমচার মতো! [৪৪] —এখানের উপমার বাহুল্য নেই।

সমরেশ বসু অচিন্ত্যকুমারকে বলেছেন 'উপমার রাজা বাংলা সাহিত্যে।'[৪৫] 'বেদে' উপন্যাসের একটি উপমার দৃষ্টান্ত —

" আমার কাঁধের উপর মুখ রেখে বলবে আরও দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পেত্রার্কের যেমন লরা, কাতুল্লুসের যেমন লেসবিয়া, মিকালএঞ্জেলোর যেমন ভিক্‌টোরিয়া কলোনা - তেমনি আমি তোমার! তোমার।"[৪৬] এখানে উপমার অনেকটা অতিরেক ঘটেছে।

প্রমথনাথ বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য প্রবাদ প্রবচনধর্মী ভাষা প্রয়োগে দক্ষ। অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যেও এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

প্রমথনাথের বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য ঃ

" জীবনে সুখ সৌভাগ্য একবার মাত্র আসে জীবনে সুখের পুনরাবৃত্তি ঘটে না" [৪৭]

" দুঃখ সুন্দরকে সুন্দরতর করে তোলে।" [৪৮]

পরিশেষে বলা যায় তুলনামূলক বিচারে প্রমথনাথের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যই বেশি।

প্রমথনাথ বিশী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র
তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রমথনাথ বিশী ও কল্লোলত্রয়ীর অন্যতম কথাশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র সমকালীন লেখক কিন্তু উপন্যাসের স্বরূপগত বিচারে সমজাতীয়তার চেয়ে পার্থক্যই বেশি চোখে পড়ে। প্রমথনাথের উপন্যাসে সমকালীন যুগযন্ত্রণার চিত্র নেই। তিনি সমাজজীবনের জটিল সমস্যা তুলে ধরেন নি তবুও তাঁর কৃতিত্ব এখানেই অতীত অনাবিষ্কৃত ইতিহাসের গোধূলি ছায়ায় পথ পরিক্রমা করে সাজিয়েছেন নীল সরস্বতীর নৈবেদ্য। তাঁর কৌতূহলী মন আদিম যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল এজন্য তার উপন্যাসের প্রসারতা

ছিল বেশি। দুটি সামাজিক ও ষোলটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে কথাসাহিত্যের জগতে তাঁর খ্যাতিলাভ ঘটেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেখানে সমকালীন বুদ্ধিপ্রধান জীবন সমালোচনা করতে গিয়ে বেছে নিলেন রূঢ় বাস্তবকে। নিম্নতম বিত্তের ব্রাত্য অন্ত্যজ শ্রমজীবি শ্রেণীর ক্লেদ পঙ্কিল জীবনবেদ শোনালেন। পাশাপাশি শোষক শ্রেণীর মুখোশ খুলে দিলেন জনসমক্ষে। এতদিন বস্তিবাসী সহায়সম্বলহীনদের জীবনকথা সাহিত্যের পাতায় ছিল উপেক্ষিত শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠির দেশ' এ কিছুটা বাস্তব চিত্র ফুটে উঠলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যে তাদের মানবিক মহিমা বস্তুতান্ত্রিক চেতনায় তুলে ধরলেন। অপরদিকে তিনি নগর জীবনের হতাশা ও বেদনার রূপকার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসগুলির শ্রেণীনির্ণয় করলে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

যুগ ও জীবনযন্ত্রণার উপন্যাস 'পাঁক', 'মিছিল', 'মৌসুমী', 'পা বাড়ালেই রাস্তা'। মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছে 'অমলতাস', 'প্রতিধ্বনি ফেরে', 'কুয়াশা', 'স্বপ্নতনু', প্রভৃতি উপন্যাসে যৌনতার কোন নগ্ন চিত্র নেই আছে শুধু প্রেম। গনচেতনাযুক্ত উপন্যাস 'প্রতিশোধ', 'সমাধান', 'হৃদয় দিয়ে গড়া' আবার নগরচেতনার দলিল স্বরূপ 'আগামীকাল', 'মিছিল', 'উপনায়ন', 'সংশয়' ও প্রশ্নমনস্কতার উপন্যাস 'মনুদ্বাদশ', 'যিনি বিধাতা', ইতিহাস ভূগোল বিষয়ক উপন্যাস 'সূর্য কাঁদলে সোনা', 'ডাকিনীর চর', মিলনান্তকতার সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'পথ ভুলে', 'প্রতিশোধ', 'ঠিকানা সঠিক', 'বাঁকালেখা' ও 'স্তব্ধ প্রহর' বিয়োগান্তকউপন্যাস - 'বিসর্পিল', 'অমলতাস', 'পাঁক', মুক্তির আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে 'উপনায়ন', 'দিকভ্রান্ত', 'যিনি বিধাতা' এবং ইহবাদিতার সুর উচ্চারিত হয়েছে 'অন্য এক নাম', 'সেই যে শহর', 'রাজোলি', 'বান্ধবী' প্রভৃতি উপন্যাসে। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মুক্তির অন্বেষার সঙ্গে দৈব অনুগ্রহ চেয়ে লিখলেন 'মেঘভাঙ্গা রোদ'

উপন্যাস। তুলনামূলক বিচারে প্রমথনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস স্বতন্ত্র ধারার। প্রেমেন্দ্র সমাজের বীভৎসতা, কদর্যতা, দারিদ্র্য, অবিশ্বাস, হতাশা দেখেছেন যা যন্ত্রসভ্যতার কুৎসিত দান।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক' বাংলা উপন্যাসের পটপরিবর্তনের নীবর সাক্ষী। তাঁর চোখে দেখা বাস্তব জীবনের দলিল। এখানে যে ছবি ফুটে উঠেছে তা হল অত্যাচারিত ও অত্যাচারকের নির্মম আলেখ্য। নীচুতলার মানুষ বিশেষত মুচি পরিবার থেকে উঠে আসা নায়ক কাঁলাচাদ যখন মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় -

" আমার হকের মজুরী দেবেনা বৈকি ?"

দুবেলা দুমুঠো ভাত, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নেই বোন পাঁচীর। পাঁচীকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে —

" কালাচাঁদ নিজের ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে হাত দিয়ে কাপড়খানা বাইরে ফেলে দিয়ে বললে, 'আমার কাপড়টা কেচে দিস তো পাঁচি। এখন আর আমায় ভাত না হলে ডাকিস নি। কাল রাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি, একটু ঘুমবো।' তারপর সশব্দে দরজার হুড়কো দিয়ে দিলে।" [৪৯]

পাঁচীর লজ্জা নিবারণের জন্য নিজের বস্ত্র খুলে দিয়ে ঘুমের ভান করতে হয়েছে এর চেয়ে রূঢ় বাস্তব আর কী হতে পারে ? শ্রমজীবী মানুষের প্রতি লেখকের এই সহানুভূতি বাংলা সাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত। লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস ভাগ্যহত মানুষের দুঃখই শেষ সত্য নয়, সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবেই - এই আশাবাদের সুর প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাদের শুনিয়েছেন। 'পাঁক' যে রুশ বিপ্লবের প্রভাবজাত তা প্রমাণিত হয় অশান্তর উক্তিতে—" 'আমি ত' পৃথিবীতে আজ দেখছি দেশ নেই,

জাতি নেই, শুধু দুটো বিরাট দল, একটা হচ্ছে যারা অবিচার অন্যায় করে, আর একটা যারা পৃথিবীজুড়ে এই পরগাছাদের রসদ জোগায়, আপনাদের কলজের রক্ত দিয়ে।" [৫০]

'মিছিল' উপন্যাস অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস, 'উপনায়নে' বিনুর কুৎসিত পঙ্কিল পরিবেশ থেকে সন্ন্যাসী হবার বাসনা, 'অমলতাস' এ দেবলার তিনটি ছেলেকে ভালোবাসা, 'প্রতিধ্বনি ফেরে'তে একজন বিপ্লবীর তিন নারীকে ভালোবাসার টানাপোড়েনের সুন্দর ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের প্লটগত দিক থেকে প্রমথনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত লেখক হিসেবেই বিবেচ্য।

প্রমথনাথ ও প্রেমেন্দ্রর উপন্যাসের ফ্রয়েডীয় যৌনচেতনার দিক থেকে পার্থক্য আছে। প্রমথনাথের উপন্যাসে যৌনতা ও যৌনতা আশ্রয়ী সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসে যৌন প্রেমের বিকৃতি নেই, নেই কোন যৌন আশ্রয়ী সংলাপ। 'অমলতাস' 'প্রতিধ্বনি ফেরে' প্রভৃতি উপন্যাসে যৌন চেতনা প্রকাশ পায় নি।

প্রমথনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দুজনেই আদর্শবাদী চিন্তাবিদ। দুজনের উপন্যাসেই স্বদেশ প্রেমের উপস্থিতি। জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, রাসবিহারী, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার। প্রমথনাথের 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাস ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল' উপন্যাস স্বদেশ চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। তবে প্রেমেন্দ্র দেশসেবার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাসে অন্বেষণের আকাঙক্ষা প্রবল।

প্রমথনাথের সংলাপরীতি ও চরিত্রসৃষ্টির যে টেকনিক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের টেকনিক সেখানে স্বতন্ত্রধারার। তাঁর চরিত্রগুলো কৌতূহল সৃষ্টি করে সংলাপে অশ্লীল ভাষার

অভাব নেই। তবুও প্রমথনাথের বাস্তবতার সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রূঢ় বাস্তবতা স্বতন্ত্রধারার। দুজন শিল্পীই প্লটকে সুসংবদ্ধভাবে গড়ে তুলেছেন।

প্রমথনাথের উপন্যাসে বিজ্ঞানচেতনার চেয়ে ইতিহাসচেতনাই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে সেখানে প্রেমেন্দ্রের বিজ্ঞানমনস্কতা যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। কল্পবিজ্ঞান, গোয়েন্দা ও চলচ্চিত্রের উপযোগী চিত্রনাট্য রচনায় প্রেমেন্দ্র সিদ্ধহস্ত। ঘনাদা চরিত্র কিশোর সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন, 'উপনায়ন' উপন্যাসটিও এই ধারার দরিদ্র ও ধনী শিশুদের পার্থক্য বর্ণনা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রমথনাথ এই ধারার উপন্যাস লেখেন নি।

পরিশেষে কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশীর স্টাইলের সঙ্গে কল্লোলের উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষারীতির তুলনা করা যেতে পারে। দুজনেই চলিত কখনো সাধুরীতির প্রয়োগ করেছেন। প্রেমেন্দ্রের সংলাপে স্থানে স্থানে কৃত্রিমতা দেখা গেলেও বুদ্ধিদীপ্ত শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁর আবেগহীন বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা প্রশংসার দাবী রাখে যেমন ঃ

(ক) " সময় তো মানুষ নয় যে হার মেনে আক্রোশ পুষে রাখবে।"[৫১]

(খ) " জীবনের তুচ্ছতম দাবীও মৃত্যুর চেয়ে বড়, একথা মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই বোঝে, মৃত্যুর শূণ্যতা তাই বারবার ভরিয়া ওঠে জীবনের কোলাহলে, সমাধির তিক্ততা ঢাকিয়া যায়।"[৫২]

(গ) সত্যিকারের পৃথিবীতে ছেলেবেলার সব রঙ যে নোংরা ময়লা হয়ে যায়, এইটেই বোধ হয় সবচেয়ে বড় দুঃখ। " [৫৩]

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত মৌখিক ভাষা যা উপমাযুক্ত -

" অদ্ভুত মুহূর্ত। একদিকে নতুন জীবনের অমোঘ আশীর্বাদ, আর একদিকে

যুগযুগান্তরের সংস্কার ঘুমন্ত সর্পের মতো মাঝে মাঝে কিলবিল করে।" [৫৪]

প্রেমেন্দ্র মিত্র ভাষার গতিশীলতা দান করবার জন্য ইংরেজী, হিন্দী গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করেছেন।

পাশাপাশি প্রমথনাথের স্টাইল উল্লেখ করা যেতে পারে।

চলিত ভাষা ঃ

" আজ এক মাসের উপর শুভ্রা এসেছে। শত চেষ্টা করেও মলিনা তার পেট থেকে আসার প্রকৃত কারণ আদায় করতে পারে নি। শুভ্রা বলেছিল আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না; তার উপরে যুদ্ধের কলকাতায় যেমন ভিড় তেমন নোংরা।" [৫৫]

— এখানে ভাষার কোন আড়ষ্টতা নেই সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা।

ইংরেজের মুখের ভাষা -

" জান আমি টোমাকে বেট্রাঘাট করিতে পারে।" [৫৬]

আঞ্চলিক ভাষা —

'আমার নাকটা মুখের মধ্যি পুরি দিয়ে কামড়াতে।" [৫৭]

পরিশেষে বলা যায় প্রমথনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের নৈকট্য বুদ্ধিদীপ্ত শব্দ প্রয়োগে ও উপমা ব্যবহারে সামগ্রিক বিচারে তাদের জীবনবোধ ও সৃজনদক্ষতা যে স্বতন্ত্রধারার এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথ বিশী ও বুদ্ধদেব বসু

তুলনামূলক পর্যালোচনা

কথাশিল্পী প্রমথনাথ বিশী ও কল্লোলের কথাকোবিদ বুদ্ধদেব বসু সমকালীন লেখক,

কথাশিল্পভুবনে তাঁরা স্ব স্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল তবুও তাঁদের মধ্যে ক্ষীণ যোগসূত্র ও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ভাবধারার মধ্যে মার্কসবাদী ভাবধারাকে উপেক্ষা করে ফ্রয়েড ও এলিসের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন দুজনেই তাঁরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের দিকে। তবে কেউই রবীন্দ্রভাবধারাকে একেবারে অস্বীকার করেন নি আবার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবকে প্রমথনাথ অকপটেই স্বীকার করেছেন।

প্রমথনাথ যেখানে স্থান কাল পাত্রের উপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন বুদ্ধদেব 'জন্মভীরু' শহরকেন্দ্রিক 'নিভৃততম' লেখক বলেই সমাজ ও ভৌগোলিক পরিবেশের উর্ধ্বে ব্যক্তিচেতনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ডঃ সুবিনয় মুস্তাফী জানিয়েছেন — "বস্তুত বুদ্ধদেবের উপন্যাসে যে জীবনচেতনা ধরা পড়ে, তা তিনটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এক. জীবনযাপন একমাত্র প্রাকৃত জনেরই নির্ধারিত নিয়তি ; দুই. শিল্পের জন্যই জীবন, জীবনের জন্য শিল্প নয়; তিন. ব্যক্তির চেতনার বাইরে কোন জগৎ নেই, থাকলেও উপেক্ষণীয়।" [৫৮]

বুদ্ধদেবের ব্যক্তিচেতনা প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরী বলেছেন —

" ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির হৃদয়ের গূঢ় গভীর পিপাসা ও আর্তি নানা কাহিনী ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। এই ব্যক্তিচেতনা লেখকের আত্মচেতনারই নামান্তর।" [৫৯]

শ্রেণীগত বিচারে প্রমথনাথের উপন্যাস সামাজিক ও ঐতিহাসিক অপরপক্ষে বুদ্ধদেবের উপন্যাস কাব্যধর্মী। বুদ্ধদেবের উপন্যাসে কাব্যধর্মিতা ফুটে উঠেছে — 'সাড়া' 'মন দেয়া নেয়া', 'রডোড্রেডনগুচ্ছ', 'সানন্দা', 'রূপালিপাখি', 'সূর্যকমল', 'অসূর্যস্পর্শা', 'যেদিন ফুটল কমল', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'মৌলিনাথ', 'পাতাল থেকে আলাপ', 'গোলাপ

কেন কালো', 'লালমেঘ', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'বাসর ঘর' প্রভৃতি উপন্যাসে।

দুজন শিল্পীই রোমান্টিকতার অনুসারী হয়েও বাস্তবধর্মী সাহিত্যিক। কিন্তু বুদ্ধদেবের বাস্তবতা প্রমথনাথ থেকে স্বতন্ত্র। শিল্পসৌন্দর্যকেই তিনি বাস্তব বলে মনে করেছেন। আর সে শিল্প মূলত নাগরিক জীবনকেন্দ্রিক। প্রমথনাথ যেখানে পল্লীজীবনের রূপকার, বুদ্ধদেব সেখানে নগরজীবনের রূপকার, ঢাকা ও কলকাতার নগর জীবনের ব্যক্তিহৃদয় তার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। প্রমথনাথ সেখানে বেছে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গ, দিল্লি ও কলকাতাকে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে দুচারটি উচ্চবিত্ত চরিত্র থাকলেও বেশিরভাগ চরিত্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভূক্ত। রাজা বাদশা ও জমিদারকেন্দ্রিক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রেক্ষাপট যেখানে তাঁর উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে তার ফাঁকে ফাঁকে বেশিরভাগ সাধারণ শ্রেণীভূক্ত মানুষের ঘটেছে নিত্য আনাগোনা। বিশেষ করে সামাজিক ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নতম বিত্তের চরিত্রকে স্থান দিয়েছেন। তুলনামূলক ভাবে বুদ্ধদেবের অধিকাংশ চরিত্র মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীভূক্ত চরিত্রে অত্যন্ত সীমিত এবং বৈচিত্র্যহীন।

নায়ক নির্বাচনের ব্যাপারে প্রমথনাথের 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' ব্যতীত সমস্ত উপন্যাসের নায়করাই সাধারণ শ্রেণীভূক্ত। কেউ প্রকৃতির প্রেমিক, কেউ কবি, কেউ সৈনিক আবার কেউ রায়বাহাদুর খেতাবধারী সাধারণ বুদ্ধিজীবী। তাদের মধ্যে একজন ছাত্রও নায়ক হিসেবে উপস্থিত। বুদ্ধদেবের উপন্যাসের নায়করা বেশিরভাগ শিল্পী কিংবা ইংরেজী সাহিত্যের কৃতি ছাত্র বা কবিতা প্রিয় অধ্যাপক এরা নাগরিক সভ্যতার প্রতিনিধি। ডঃ সুকুমার সেন বুদ্ধদেবের উপন্যাসকে ড্রয়িংরুম কেন্দ্রিক উপন্যাস বলে মন্তব্য করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাসের নায়ক বুদ্ধদেব স্বয়ং।

'সাড়া' উপন্যাসের সাগর চরিত্র ' যেদিন ফুটল কমল' এর পার্থপ্রতিম 'বাসরঘর' উপন্যাসের পরাশর, ' একদা তুমি প্রিয়ে' উপন্যাসে পলাশ এদের ভাবনা, চিন্তা, কথাবার্তা অনুভূতি মূলত লেখকের, পরোক্ষভাবে লেখকই যেন হয়ে উঠেছে নায়কচরিত্র। প্রমথনাথের 'কেরী সাহেবের মুন্সী'র রামরামবসু, 'পদ্মা'র বিনয় ও 'কোপবতী' উপন্যাসের বিমলের ধ্যান ধারণা ও কণ্ঠস্বর মূলত প্রমথনাথের কণ্ঠস্বর।

প্রমথনাথ ব্যক্তিজীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গান্ধীবাদের প্রতি ছিল তাঁর অখন্ড বিশ্বাস। 'বঙ্গভঙ্গে'ও 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসে স্বদেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সেখানে বুদ্ধদেব বসু রাজনীতিকে নিয়ে মাথা ঘামান নি সাহিত্যে কমিউনিজমের ধার ধারেন নি। এমনকি 'পরস্পর' উপন্যাসে কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করেছেন ঃ —

(ক) ' বড় চুলওলা কোনো পেশাদার কম্যুনিষ্ট'

(খ) ' গৃহ দাও তুলে । তার দীর্ঘ কম্যুনিষ্ট চুলের ঝাকড়া আবেগ দুলে উঠলো । পরিবার দাও তুলে।'

— এর মধ্যে সাম্যবাদী চিন্তার বিকৃত রূপ উচ্চারিত। আসলে জন্মরোমান্টিক লেখকের কাছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কোন গুরুত্ব পায়নি।

'কালো ঘোড়া' উপন্যাসে ধর্মীয় ভন্ডামীর প্রতি বিদ্রূপ করেছেন। বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে যা সত্য ও সুন্দর তা গ্রহণীয় হয়েছে, কোন অকারণ উচ্ছ্বাসকে তিনি উপেক্ষা করেছেন।

প্রমথনাথ ও বুদ্ধদেব দুজনেই প্রেমভাবনার অন্যতম রূপকার। কিন্তু তাদের প্রেমভাবনার মৌলিক পার্থক্য হল প্রমথনাথের নায়ক নায়িকাদের বিয়োগান্তকপরিণতি দিয়েই উপন্যাস শেষ হয়েছে সেখানে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে

নায়ক নায়িকার মিলনের মধ্যে। দুজনের উপন্যাসেই নায়ক নায়িকাকে ঘিরে প্রেমের লাবণ্য, বর্ণদীপ্ত সৌন্দর্য, স্বপ্ন, বেদনা, পুণর্মিলন যেন রোমান্টিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। প্রমথনাথের 'কোপবতী' উপন্যাসের বিমল ফুল্লরা, 'লালকেল্লা'র জীবনলাল, তুলসী ও রুমালী, 'পদ্মা'র বিনয় কঙ্কণের, এছাড়া দর্পনারায়ণ বনমালার প্রেমচেতনা নিপুণ শিল্পতুলিকার স্পর্শে কাব্যময় হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথ অশরীরী প্রেমকে স্বীকার করেন নি আসঙ্গবাসনা দেহকে ঘিরে অনুরণিত হয়েছে প্রেমের আর্তি, দেহও আত্মার যন্ত্রণা ও করুণ ক্রন্দন, ত্যাগ, আত্মনিবেদনের অভিব্যক্তিতে ঈশ্বরের বন্দনা কত মধুর রূপের সঞ্চার ঘটেছে পাঠক হৃদয়ে তা প্রমথনাথ বিশীর অনুরাগী পাঠক মাত্রই জানেন।

বুদ্ধদেবের সাহিত্যের মূল উপজীব্য প্রেমভাবনা। শতফুল বিকশিত হয়ে উঠেছে তার প্রেমচিত্রণে। বুদ্ধদেরের নায়িকারা প্রত্যেকেই এডোলেসেন্ট প্রত্যেকেই নাগরিক সভ্যতার প্রতিনিধি।

অনন্ত যৌবনের কবি' যখন বলেন—

" বাসনার বক্ষমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর —
রক্তে আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণীরমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতিনিতি" [৬০]

— প্রেমের জন্ম যেমন দেহ থেকেই তেমনি দেহ থেকেই প্রেমের ঘটে উত্তরণ। তাই তাঁর প্রেমভাবনা দেহসর্বস্বতার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও দেহাতীত প্রেম দুর্লভ হয়ে ওঠে নি। 'যবনিকাপতন',' রডোড্রেডনগুচ্ছ', ' কালো হাওয়া', 'সাড়া', প্রভৃতি

উপন্যাসে এই ধারারই অভিব্যক্তি। যেখানে প্রেমের লীলা রহস্য অতীন্দ্রিয় লোকের দিকে যাত্রা করেছে। তাইতো 'মন দেয়া নেয়া' উপন্যাসের নায়িকা বলতে পারেন—

" প্রেম হচ্ছে মানুষের জীবনের সবচেয়ে মহান জিনিস। প্রেম থেকেই সব আর্টের জন্ম , প্রেমের মত আর কিছু নাই। "[৬১]

তবে প্রেমের অন্ধ আবেগকে মেনে নেননি যা আত্মবিনাশকে ডেকে আনে।

বুদ্ধদেব বিবাহের চেয়ে প্রেমকেই বড় করে দেখেছেন। মিলন হয়েছে বলেই তো বিবাহ কাজেই মিলন বা প্রেমই বড়। 'নবনীতা', 'মন দেওয়া নেওয়া', 'বিশাখা' উপন্যাসে এই মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। প্রমথনাথের 'কোপবতী' উপন্যাসে আছে 'বিবাহ মানেই প্রেমের অপমৃত্যু' তিনিও বিবাহের চেয়েও প্রেমকেই বড় করে দেখেছেন।

বুদ্ধদেবের উপন্যাস সম্পর্কে অচ্যুত গোস্বামী মন্তব্য করেছেন—

" .... তাঁর সাহিত্যকর্ম সংখ্যায় বিপুল, বৈচিত্র্য নয় এবং আশ্চর্য এই যে তাঁর প্রতিটি রোমান্টিক কাহিনী হুবহু একরকমের — সাহিত্যিক বা অধ্যাপক নায়ক এবং সাহিত্য প্রেমী এডোলেসেন্ট নায়িকা। একই ধরণের জিনিস বারবার লিখতে কী করে যে ক্লান্তি আসে বা ভাবতে অবাক লাগে। "[৬২]

প্রমথনাথ ও বুদ্ধদেবের প্রকৃতি প্রেমের তুলনা করা যেতে পারে। প্রমথনাথ ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। প্রকৃতি বর্ণনায় অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি ও রহস্যবোধ উচ্চারিত । 'পদ্মা', 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসে উত্তরবঙ্গ ও 'কোপবতী' উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসগুলোতে মানবচরিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির অপূর্ব মেল বন্ধন ঘটেছে। ঠিক তার পাশাপাশি বুদ্ধদেবের প্রকৃতি প্রেম মূলত নরনারীর অন্তর্জগতের রহস্যঘনতার পরিচায়ক। জ্যোৎস্না, বর্ষা, অরণ্য, পর্বত, সূর্যালোক প্রেমের

াংকেতিকতায় আভাসিত। 'একদা তুমি প্রিয়ে'তে বর্ষার বাতাস, 'নিভৃততম ' উপন্যাসে বিদ্যুৎ চকিত অন্ধকারে পার্থপ্রতিমের সংলাপ, 'সানন্দা' উপন্যাসে সঞ্চয় ও সানন্দার প্রমানুভূতি শান্তিনিকেতনের এক বর্ষনমুখর সন্ধ্যায় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে--

--- " প্রিয় সঞ্জয়, শান্তিনিকেতনে বর্ষা এসেছে। না দেখলে বুঝতে পারবে না কি ুন্দর এই বর্ষা।" — এ যেন ছায়ায় ঘেরা শান্তিনিকেতনে এক রাবীন্দ্রিক অনুভবকে দ্যোতিত করেছে।

অপরদিকে প্রমথনাথের প্রিয় ঋতু ঋতুরাজ বসন্ত — শাল, পিয়ালের গন্ধে ভরপুর নলক্ষ্মীর সৌন্দর্যানুভূতি লেখকের নায়ক নায়িকার মনে এক স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করেছে।

প্রমথনাথ পল্লীপ্রেমিক কলকাতার নাগরিক জীবনের বিকৃত ক্লেদাক্ততায় এক মেকী প্রম অনুভব করেছেন। 'পদ্মা' উপন্যাসে বিনয় কলকাতার নাগরিক সভ্যতার নারী প্রতিনিধি ারুলের প্রেম প্রত্যাখ্যান তার জীবনকে শরাহত করেছে তাইতো বিনয় তার অতীত প্রমিকা যে পল্লীবাংলার নারীসমাজের প্রতিনিধি কঙ্কণের মধ্যেই খুঁজে পেতে চেয়েছিল জীবনের যথার্থ মানে। অপরদিকে বুদ্ধদেব নাগরিক সভ্যতার রূপকাররূপে সবচেয়ে ালবেসেছেন কলকাতা ও ঢাকা শহরকে। 'রডোড্রোডনগুচ্ছ' , 'হে বিজয়ী বীর, অকর্মণ্য', মন নেয়া নেয়া', 'সানন্দা', 'পারিবারিক' উপন্যাসে -- প্রেমানুরাগ ঢাকার প্রকৃতির সঙ্গে ুক্ত হয়েছে। ঢাকার বর্ষা প্রকৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে বুদ্ধদেব লিখেছেন — " সারা আকাশ মেঘে মেঘে নিবিড় — স্তরের পর স্তর, ঢেউয়ের পরে ঢেউ, গাঢ় নীল ; কখনো দিগন্ত থেকে যেন মেঘ স্তম্ভ উঠে আকাশ বিদীর্ণ করে দিতো ;" [৬৩]

'রডোড্রেডনগুচ্ছ' উপন্যাসে কলকাতা যেন প্রেমিকা, কি মোহময়ী আনন্দদায়িনী াস্যময়ী কলকাতা ঃ

" কলকাতা আবার কলকাতা। কী মুক্তি । কী আনন্দ। "[৬৪]

আবার যখন 'পরস্পর' উপন্যাসে কলকাতার প্রেমে পড়ে বুদ্ধদেবের নায়ক বলেন —

" আর কী সুন্দর, কী সোনালি সুন্দর এই বিকেল ঃ আর কী সুন্দর , কী আশ্চর্য এই কলকাতা। দেখে শুনে চোখের তৃষ্ণা মেটে না। "[৬৫]

ঢাকার লক্ষ্মীবাজার, বক্সীবাজার, পুরান পল্টন, নারায়ণগঞ্জের কথা তার উপন্যাসে থাকলেও লাজুক মেয়ের মত কল্লোলিনী কলকাতাকেই বুদ্ধদেব মনে প্রাণে ভালবেসেছেন।

প্রমথনাথ ও বুদ্ধদেব দুজনেই ইংরেজী সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহুগ্রন্থ পাঠ করে ফর্ম ও কনটেন্ট সাজিয়েছেন দুজনেই। তবুও বুদ্ধদেবের রচনায় রবীন্দ্র প্রভাবের সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলী, হুইটম্যান, রাশিয়ান ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের প্রভাবকে স্বীকার করেছেন বুদ্ধদেব। প্রমথনাথের উ পন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার ও ইংরেজ কবি শেলী ও কীট্সের প্রভাব পড়েছে সন্দেহ নেই।

প্রমথনাথ ও বুদ্ধদেবের স্টাইলের পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রমথনাথের প্রাক্স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসে তৎসম শব্দ বহুল কাব্যময় ভাষা, পরবর্তী উপন্যাসে চলিত ভাষা, স্থানে স্থানে দেশীশব্দ, আঞ্চলিক ভাষা, হিন্দী, ইংরেজী বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেখানে বুদ্ধদেব বসু কলকাতার চলিত ভাষা ইংরেজী সংলাপ, বাক্যব্যবহারে শাণিত বুদ্ধি, প্যারাডক্সের ব্যবহার করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় ভাবে, ভাষায়, শিল্পরূপে ও বিষয়বস্তু নির্বাচনে বুদ্ধদেব বসুর বৈদগ্ধ্যতা ও সূক্ষ্মরুচি বোধের পরিচয় মিললেও প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের তুলনায় স্বাতন্ত্র্যই বেশি।

প্রমথনাথ বিশী ও প্রবোধ কুমার সান্যাল
তুলনামূলক পর্যালোচনা

প্রমথনাথ বিশী ও প্রবোধকুমার সান্যাল দুজন সমকালীন শিল্পী কিন্তু শিল্পকর্মের দিক থেকে তাঁদের ব্যবধান দুস্তর। একজন কল্লোলের প্রাণধর্মে উজ্জ্বল অন্যজন কল্লোল থেকে স্বতন্ত্র ভাবধারায় লালিত অথচ দুজনেই কল্লোলের লেখক ।

প্রমথনাথের ঐতিহ্যপ্রীতিই তাঁর প্রতিভাকে স্বতন্ত্র শিল্পমূল্য দিয়েছে। অতীতের প্রতি মোহই তাঁর শিল্প সফলতার শীর্ষস্থান অধিকার করেছে সন্দেহ নেই। ধূসর অতীতের অনাবিষ্কৃত জগৎ তিনি আবিষ্কার করতে গিয়ে বিষয়বস্তু, চরিত্র সৃষ্টি, নাটকীয় ঘটনা ও জীবন সংঘাত নিপুণ শিল্পতুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সহাবস্থান করে এক অনন্য ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁর পরিচয়।

অপরদিকে প্রবোধকুমারের শিল্পীব্যক্তিত্বের মৌল পরিচয় বোহেমিয়ত্ব হলেও তিনি কখনও সমাজদ্রোহী লেখক কখনও বাস্তব কখনও রোমান্টিক শিল্পী কখনও ধর্ম চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। কল্লোলের যৌবন চেতনার মূর্ত্ত প্রতীক তিনি। এক বহুমুখী জীবনবোধ তাঁর শিল্পচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্ক্যান্ডিনেভীয় বোহেমীয় যাযাবরী মানসিকতা গড়ে উঠবার পেছনে যে হামসুন ও বোয়ারের কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পাঠ একথা তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যক্তি জীবনে কর্মসূত্রে কিংবা ভ্রমণসূত্রে বিচিত্র জনমানসের সঙ্গে তাঁর আত্মিক পরিচয় সেই অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে লিখেছেন বৈচিত্র্যময় উপন্যাস।

প্রমথনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপেই শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর উপন্যাসের একদিকে

রাজা, বাদশা, জমিদার অন্যদিকে সাধারণ মধ্যবিত্ত চরিত্র নায়কের মর্যাদা লাভ করেছে। সামাজিক উপন্যাস হিসেবে 'পদ্মা' ও 'কোপবতী'তে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও কৃষক পরিবারের বাস্তব জীবন সমস্যা ও প্রেম মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ঠিক তেমনি প্রবোধকুমারের প্রথম পর্বের উপন্যাসে বিশেষত 'কলরব', 'প্রমিলার সংসার', 'বনহংসী' প্রভৃতি উপন্যাসে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের যন্ত্রণা, গ্লানি ও চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখানো হয়েছে। সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ছবি বাস্তবসচেতনভাবে ফুটে উঠেছে. 'দুই আর দুয়ে চার' উপন্যাসে। শহর ও শহরতলীর নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের নানা ছবি এই ধারার উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এছাড়া 'প্রিয়বান্ধবী', 'অগ্রগামী', 'আঁকাবাঁকা', 'নদ ও নদী', 'শ্যামলীর স্বপ্ন' উপন্যাসে বোহেমিয় জীবনের সঙ্গে আদর্শবাদ উচ্চারিত হয়েছে।

প্রমথনাথের উপন্যাসে নারীপুরুষের প্রেমের সম্পর্কের যৌনতা ও আবেগের আতিশয্য ফুটে উঠেছে 'লালকেল্লা', 'কেরী সাহেবের মুন্সী', 'কোপবতী', ও 'পদ্মা' উপন্যাসে। কিন্তু প্রবোধকুমারের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের প্রেম সম্পর্কে যৌনতা ও আবেগের আতিশয্য নেই। এখানে আছে উচ্ছ্বাসহীন বন্ধুত্বের বন্ধনহীনতায় নায়ক নায়িকাকে বাঁধতে চেয়েছেন। শান্ত স্নিগ্ধ প্রেমচেতনা জাগ্রত হয়েছে তাঁর নায়ক নায়িকার। প্রমথনাথের মতো প্রেমিকার আর্তি এখানে অনুপস্থিত। প্রবোধকুমারের রোমান্টিক বোহেমিয় যাযাবর মনের পরিচয় মেলে 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'যাযাবর' ও 'উত্তরহিমালয় চরিত' ভ্রমণ সাহিত্য বিষয়ক উপন্যাসে দুর্গম হিমালয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটনে শিল্পীমন ছিল অস্থির।

প্রবোধকুমারের নিজের কথায় ঃ

" মনে পড়ে সেদিন চিত্তলোকে একটা প্রবল আলোড়ন ছিল।.... কিছু আমার চাই, কিন্তু তার সত্য স্বরূপ আমার জানা নেই।.... একথা জানতুম সে প্রশ্ন উঠে

দাঁড়ায় অস্তিত্বের মূল কেন্দ্র থেকে।'[৬৬]

— এর মধ্যে যে প্রবোধকুমারের আধ্যাত্মিক জীবনচেতনা যুক্ত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রমথনাথের 'পদ্মা' উপন্যাসে বিনয়ের হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ ও হিমালয়যাত্রা, 'কোপবতী' উপন্যাসের কোপাই এর উৎস সন্ধানে বিমলের যাত্রায় কল্লোলের বোহেমিয়তার আপাত লক্ষণ ফুটে উঠলেও এদের নিহিত অস্তিত্বে উপযুক্ত বোহেমিয়ত্ব ছিল না। আবেগধর্মের দিক থেকে প্রবোধকুমার ও প্রমথনাথের আপাত যোগসূত্র ও রোমান্টিক চেতনার স্বাধর্ম থাকলেও শিল্পীদ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য বর্তমান।

প্রমথনাথের 'চলনবিল' উপন্যাসে প্রগতিপন্থী মানবিক আদর্শবোধের প্রতিফলন ঘটেছে 'চলনবিল' উপন্যাসের দর্পনারায়ণ চরিত্রে ও 'কেরী সাহেবের মুন্সী' উপন্যাসের রামরামবসু চরিত্রে। ঠিক তেমনি প্রবোধকুমারের 'নদ ও নদী', 'কাঁচকাটা হীরে' 'উত্তরকাল' 'হাসুবানু' উপন্যাসে লেখকের আদর্শনিষ্ঠ চিন্তাচেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রমথনাথ ও প্রবোধকুমার দুজনেই প্রকৃতি প্রেমিক। প্রবোধকুমারের 'জলকল্লোল' 'মহাপ্রস্থানের পথে' 'উত্তর হিমালয় চরিত' উপন্যাসে নিসর্গ চেতনার অনবদ্য স্বাক্ষর মেলে। বর্ণনা সেখানে হয়ে উঠেছে আবেগধর্মী। তবে প্রবোধকুমারের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রকৃতিচেতনা আবেগধর্মী হয়ে ওঠেনি। অপরদিকে প্রমথনাথের নিসর্গ প্রকৃতি আবেগধর্মী হয়ে উঠেছে 'পদ্মা' 'কোপবতী' ও 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত' উপন্যাসে। লাবণ্যময় ভাষায় নিসর্গচেতনা এখানে অনবদ্য।

প্রমথনাথের স্বাতন্ত্র্য এখানেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ফুটিয়ে তুলেছেন 'পনেরোই আগষ্ট' ও 'বঙ্গভঙ্গ' উপন্যাসে। এটা তাঁর জাতীয়

ভাবনা ও স্বদেশ চেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। বাংলা সাহিত্যে এরূপ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা কেন্দ্রিক উপন্যাস আর রচিত হয় নি। প্রবোধকুমার ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাস সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না।

প্রবোধকুমার ও প্রমথনাথের ভাষাশৈলীর তুলনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রমথনাথের প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের উপন্যাসে ভাষার আবেগময়তা, উপমার বাহুল্য, রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। প্রমথনাথের সরল প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ বিশিষ্ট ভাষার সঙ্গে পান্ডিত্যপূর্ণ আপ্তবাক্য, আঞ্চলিক ভাষা, ইংরেজী, হিন্দী সংলাপ, সাধু ও চলিতরীতির ভাষা প্রয়োগে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রবোধ কুমারের ভাষায় আতিশয্য ব্যঞ্জনাগর্ভ সংলাপের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। ভাষার আবেগময়তার দৃষ্টান্ত ঃ

" মায়ালতা বললে, পৃথিবী বড় জটিল, সংসার বড় নির্দয়, জীবন বড়ই সমস্যাসঙ্কুল। আজকের তুমি আপন, কালকের তুমি পর।"[৬৭]

প্রবোধকুমারের নাট্যধর্মী আবেগাত্মক সংলাপ 'আঁকাবাঁকা' উপন্যাসের মীনাক্ষীর উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে —

" ঘর আমি চাইবো না, সন্তান আমি কামনা করব না, সুখ আমি অবহেলায় ত্যাগ করব, শৃঙ্খলার মধ্যে আমি বন্দিনী সাজবো না - বিপ্লব বাদিনী আমি।"[৬৮]

প্রবোধ কুমারের বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য ঃ

" অতিরিক্ত আনন্দ এবং অতিরিক্ত তৃপ্তি হইতেছে অতিরিক্ত যন্ত্রণাদায়ক।"

প্রবোধকুমারের সুষম অলঙ্কার প্রয়োগ একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে বলা যায়, প্রমথনাথ ও প্রবোধকুমার দুজন স্বতন্ত্রধারার লেখক হলেও ভাষাগত দিক থেকে তাঁদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উল্লেখপঞ্জী

১) কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, প্রভাতকথা, বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৯ সাল।

২) সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খন্ড।

৩) অরুণ সান্যাল, প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস, পৃঃ ১৩৮

৪) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিঠি, প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে।

৫) কয়েক প্রহরের স্মৃতি, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কালি ও কলম, তারাশঙ্কর সংখ্যা পৃঃ ৭৯৩

৬) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - স্বনির্বাচিত গল্প, ভূমিকা।

৭) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - তদেব

৮) প্রমথনাথ বিশী - 'পদ্মা' পৃঃ ১০৬

৯) প্রমথনাথ বিশী - 'কোপবতী' পৃঃ১৬৯

১০) প্রমথনাথ বিশী - 'অশ্বত্থের অভিশাপ' পৃঃ ৬১৩ - ৬১৫

১১) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - 'ধাত্রীদেবতা' - পৃঃ ১৭৯

১২) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - তদেব - পৃঃ ১০৬

১৩) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় - 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', পৃঃ৪১১

১৪) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, পঞ্চম প্রকাশ, পৃঃ ২৯০

১৫) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই বসু - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর ভূমিকা, ১ম সংস্করণ।

১৬) Budhadev Basu, An Acre of Green Grass, 1st edition, Pg. 85

১৭) প্রমথনাথ বিশী, 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', পৃঃ ১৭০

১৮) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - 'পুতুলনাচের ইতিকথা', পৃঃ ৬৪

১৯) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - 'পদ্মা নদীর মাঝি'- পৃঃ ১

২০) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - তদেব- পৃঃ ৩৯

২১) প্রমথনাথ বিশী - 'লালকেল্লা পৃঃ ৩৮০

২২) প্রমথনাথ বিশী - 'বঙ্গভঙ্গ' পৃঃ ১৪৭

২৩) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - 'তদেব' - পৃঃ ৭৫

২৪) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - সোনার চেয়ে দামী - পৃঃ ৩৪

২৫) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - অপরাজিত পৃঃ ৩৭

২৬) সমরেশ মজুমদার, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের 'আরণ্যক', পৃঃ ৩৭

২৭) প্রমথনাথ বিশী, 'কোপবতী' পৃঃ ১২৩

২৮) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় - 'অপরাজিত' পৃঃ ৬৭

২৯) প্রমথনাথ বিশী- 'লালকেল্লা' পৃঃ ৪৩০

৩০) প্রমথনাথ বিশী- 'বঙ্গভঙ্গ' পৃঃ ১৭৮

৩১) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় , 'আরণ্যক' পৃঃ ১১

৩২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়- তদেব পৃঃ ২০

৩৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড পৃঃ ১৬৪

৩৪) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় , বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃঃ ২২৯

৩৫) অচিন্ত্যকুমার সেনগু প্ত - কল্লোল যুগ, পৃঃ ২৭৫

৩৬) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় - 'বাংলার মেয়ে' পৃঃ ১০৬

৩৭) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় - ' আকাশ কুসুম' পৃঃ ১২

৩৮) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় - 'ষোল আনা' পৃঃ ৪৭

৩৯) মনোজ বসু, ভূমিকা 'জলজঙ্গল'

৪০) রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩১ শে আশ্বিন, ১৩৩৫

৪১) নতুন সাহিত্য, সপ্তম বর্ষ, মাঘ ১৩৬৩, পৃঃ ৫৯

৪২) অচিন্ত্য রচনাবলী , ১ম খন্ড , পৃঃ ৩৯৮

৪৩) প্রমথনাথ বিশী - 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' পৃঃ ১০৭

৪৪) প্রমথনাথ বিশী - 'চলনবিল' পৃঃ ১২৪

৪৫) সমরেশ বসু 'বেদে' অনেক দিনের অনেক কথা, পৃঃ ৯৬

৪৬) অচিন্ত্য গ্রন্থাবলী পৃঃ ৮২

৪৭) প্রমথনাথ বিশী- 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার'

৪৮) প্রমথনাথ বিশী - 'কেরী সাহেবের মুন্সী'

৪৯) প্রেমেন্দ্র মিত্র - ' পাঁক' পৃঃ ২৫

৫০) প্রেমেন্দ্র মিত্র - তদেব পৃঃ ৪৭

৫১) প্রেমেন্দ্র মিত্র - ' প্রতিধ্বনি ফেরে ' পৃঃ ১২৩

৫২) প্রেমেন্দ্র মিত্র - 'কুয়াশা' পৃঃ ৭০

৫৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র - 'মৌসুমী' পৃঃ ৭১

৫৪) প্রেমেন্দ্র মিত্র - 'হৃদয় দিয়ে গড়া' পৃঃ ৪৯

৫৫) প্রমথনাথ বিশী - 'পনেরোই আগষ্ট'

৫৬) প্রমথনাথ বিশী - 'বঙ্গভঙ্গ'

৫৭) প্রমথনাথ বিশী - 'লালকেল্লা'

৫৮) অরুণ সান্যাল - প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস পৃঃ ৫৬৩

৫৯) গোপিকানাথ রায় চৌধুরী - বাংলা কথা সাহিত্যঃ প্রকরণ ও প্রবণতা।

৬০) বুদ্ধদেব বসু - 'বন্দীর বন্দনা' পৃঃ ৪ বুদ্ধদেব রচনা সংগ্রহ

৬১) বুদ্ধদেব বসু - 'মন দেয় নেয়া', বুদ্ধদেব রচনা সংগ্রহ ২য় খন্ড, পৃঃ ৭০

৬২) অচ্যুত গোস্বামী, বাংলা উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ২৬৪

৬৩) বুদ্ধদেব বসু - প্রবন্ধ সংকলন পৃঃ ২৯৮ - ২৯৯

৬৪) 'রডোড্রেডন গুচ্ছ', বুদ্ধদেব রচনা সংগ্রহ পৃঃ ২৯৩

৬৫) বুদ্ধদেব বসু - 'পরস্পর' পৃঃ ১৬৭

৬৬) কথা সাহিত্য ঃ বৈশাখ ১৩৫৯

৬৭) প্রবোধকুমার সান্যাল - 'অগ্রগামী' পৃঃ ১৯৭

৬৮) প্রবোধকুমার সান্যালের রচনাবলী, প্রথম খন্ড পৃঃ ১০৬